ভাষা ভাবনা

ক্ষুদিরাম দাস

সমর্পিত

বাঙ্লা ভাষা শহিদদের উদ্দেশে

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সম্মত বাঙ্লা ব্যাকরণ	৫
ব্যাকরণ-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ	১৬
বানান-সমস্যা সমাধানের একটা পথ	২৭
কী লিখি, কী বলি	৩৫
সাঁওতালী ও বাঙলা	৪৩
বাঙলার গ্রাম-নামের উৎস নিরূপণ	৪৯
বাঙ্লা গ্রাম-নাম ও কলিকাতা শব্দের ব্যুৎপত্তি	৫৯
বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি	৬২
বাঙ্লা ছন্দ, সুনীতিকুমার ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ	৬৯

আচার্য ক্ষুদিরাম দাস জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে নিবেদন-

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মনে করেন – ভাষা একটি বহতা নদীর মতো প্রবাহমান। সেই ভাষা প্রবাহের স্রোতপথ, বিভিন্ন বাঁক নেওয়া, আবর্ত সৃষ্টি ও তার সাথে অন্যান্য স্রোতের মিশ্রণ প্রভৃতি লক্ষ্য করে, একটি নিয়মনীতি উপস্থাপিত করাই সেই ভাষার ব্যাকরণ। বাংলা ভাষা পথের এই গতিশীল ইতিবৃত্তের সন্ধানে অধ্যাপক দাস যে শ্রম নিয়োগ করেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে । বিস্মিত করে তার ইতিহাস –অনুগত ভাষা বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণা ।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে এসেছে বিজ্ঞান সম্মত বাঙ্‌লা ব্যাকরণের রূপরেখা, বানান-সমস্যা সমাধানের একটি পথ, সাঁওতালী-বাঙলা ভাষা-সম্পর্ক, বাঙলার গ্রাম-নামের উৎস নিরূপণ, ছন্দ প্রসঙ্গ ইত্যাদি ।

আমরা অধ্যাপক দাসের নয়টি প্রভূত গবেষনালব্ধ মৌলিক ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ ‘ভাষা ভাবনা’ শিরোনামে সংকলিত করেছি । আমরা মনে করি এই সংকলনটি বাংলা ভাষার চলমানতার একটি অমূল্য দলিল হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞান সম্মত বাঙ্লা ব্যাকরণ

বিজ্ঞান সম্মত বলা হচ্ছে কেন ? তার জবাবে বলা যায়- লোকমুখে ভাষার বিকাশ ঘটে। ভাষা অধ্যয়নের ফলে এই বিকাশ ধরা যায় এবং তার সূত্রও নির্ধারণ করা যায়। এই সূত্রগুলি আবিষ্কার করার মধ্যে ভাষার উচ্চারণ ও ভাষার বাক্য-নির্ভর অর্থগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে লোকসাধারণের মানসিক ও বৌদ্ধিক কতকগুলি নিয়ম কাজ করছে এটা বেশ উপলব্ধি করা যায়। অল্প স্বল্প ব্যতিক্রম যে থাকে না এমন নয়। কিন্তু তা নগণ্য। এবং সেসব ব্যতিক্রমের মধ্যে যে ভিন্নতর নিয়ম কাজ করছে এমনটাও ধরা যায়। বিজ্ঞানে নিয়মের রাজত্ব। পৃথিবী নিয়মমাফিক সূর্যকে আবর্তন করছে, তাই চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রাদির উদয় ও অপসরণ ঘটছে, ঋতুপর্যায় চলেছে, জোয়ার-ভাটা চলেছে, বাতাস বইছে, বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব হচ্ছে, আবার বীজাঙকুরের-ন্যায়ে তরুলতা জন্মাচ্ছে, ফলফুলের বিকাশ ঘটছে, হাইড্রোজেন কার্বন অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থের নানা রীতির সমবায়ে সৃষ্টিক্রিয়া অব্যাহত এবং বিকশিত থাকছে। মানুষও এইসব নিয়ম আয়ত্ত ক'রে নিয়ে যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, বিদ্যুশক্তি আবিষ্কার করে সাধারণ বুদ্ধিতে যা অসাধ্য তাও সাধন করছে। ভাষার নাড়ী-নক্ষত্র বিচার ক'রে তারও নিয়ম পরম্পরা আবিষ্কার করা যায়। যিনি ধরিয়ে দেন তিনি ভাষাবিজ্ঞানী বা ভাষাতাত্ত্বিক। বিশ্বে প্রচলিত মুখ্য আধুনিক ভাষাগুলির গঠন ও বিকাশের সূত্র তাঁরা নির্ণয় করেছেন এবং 'ব্যাকরণ' অর্থাৎ ভাষার চলনশীল এবং সম্ভাব্য কিছুকালের বিধিবদ্ধ রূপও তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু ভাষা নদীপ্রবাহের মত অগ্রগতিশীল ও প্রসারশীল সেইহেতু তার কালবিশেষের প্রচলিত রূপ-ও জনস্বার্থে প্রকাশ করে দেখাতে হয়। তবু কোনো ভাষার ব্যাকরণ হ'ল কেবল তার বিবরণমূলক ব্যাখ্যানই নয়, তার সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা ক'রে বিধি-নির্দেশও দিয়ে দেওয়া। ব্যাকরণ একটি শাস্ত্র অর্থাৎ শাসনধর্মী ব্যাপার। কেবল descriptive নয়, সেই সঙ্গে normative ও। পাণিনি শিক্ষিত জনের সাংখ্যা গরিষ্ট ব্যবহার অধ্যয়ণ করে তদনুযায়ী নিয়মের শাসনে সুনির্দিষ্ট ক'রে সংস্কৃতকে বেঁধেছিলেন। এই ভাবে কোনো ব্যাকরণে যে বিধি দিয়ে দেওয়া হয়, তার অনুসরণে শিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত জনেরা

বেশ কিছুকাল বাক্-ব্যবহার করেন অর্থাৎ ভাষনে ও লিখনে প্রদত্ত নিয়মের বশবর্তী থাকেন। কিন্তু ক্রমে নানা কারণে জনসাধারনের মুখে মুখে ভাষা কিছু কিছু পরিবর্তিত হতে হতেই চলে। সে পরিবর্তন যখন পুনরায় সংখ্যায় বেশি ও প্রকট হয়ে ওঠে এবং শিক্ষিত সাধারণের লিখিত ভাষাকেও আক্রমন করে, লেখাপড়ায় ও বোধে অল্পস্বল্প বিঘ্ন ঘটাতে থাকে তখন ভাষা সম্পর্কে নূতনতর বিধির প্রয়োজন হয়, নোতুন ব্যাকরণ লিখতে হয়।

আমাদের দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মুখ্য মৌখিক ভাষা ছিল চারটি- (১) প্রাচীনতম অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বা কোল-মুণ্ডা শ্রেনীর মানুষের ভাষা (২) পশ্চিম প্রান্তীয় অবস্থান থেকে দক্ষিণাপথের কিচ্ছু অংশ পর্যন্ত ব্যাপৃত দ্রাবিড়-ভাষীদের ভাষা (৩) মঙ্গোলিয়া-চীন-ভূখন্ড থেকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে উপনিবিষ্ট অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু কিরাত জাতির ভাষা এবং (৪) পারস্য আফগানিস্থান থেকে সদ্য-আগত ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্টীর অন্তর্গত আর্যশাখার ভাষা। একাধিক ঐতিহাসিক কারণে উত্তর ভারতে (প্রথমে পশ্চিম-উত্তর, পরে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র উত্তর অংশে) আর্যভাষা-ভাষীরা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কোল-মুন্ডারী ভাষাকে পশ্চাৎপদ ক'রে প্রথমে শিক্ষিত জন মধ্যে এবং পরে প্রায় সর্ব-জন মধ্যে তাদের ভাষা প্রচলিত করে। এমনটি ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর থেকে খ্রীঃ পূঃ পাঁচশ' অর্থাৎ দুহাজার বছর ধ'রে। মূখ্যভাবে এই কালমধ্যে এবং বেশ কিছু পর পর্যন্ত ও কোল-মুণ্ডা বা নিষাদ গোষ্টীর অনার্যদের আর্যীকরণ চলতে থাকে এবং আর্য-অনার্য রক্ত-বিমিশ্রণ ও গোত্র হারানোর বহু বিচিত্র পর্যায়ও সংঘটিত হতে থাকে। আমাদের অনুমান ঐসময়ের মধ্যে ক্রমশঃ বৈদিক সংস্কৃত থেকে স্বাভাবিক বিচ্যুতি সহ এক ধরণের ভাঙা সংস্কৃত উত্তর ভারতে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত জ'ন মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং শুদ্রেরাও নিজ নিজ অন-আর্য ভাষা ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ভাঙা সাংস্কৃতে পরে তজ্জাত প্রাকৃত ভাষায় লোকব্যবহার চালাতে থাকে। কোল নিষাদ বা সাঁওতাল –খেড়িয়া অধ্যুষিত বাঙলায় আর্য অর্থাৎ ভাঙা ভাঙা সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে, তার দুশ' চার'শ' বছর আগে কান্যকুব্জে মগধে। এই সময় থেকেই আর্যবর্তের বহু বিমিশ্রিত আর্য-অনার্য সম্প্রদায়ের মানুষ রাষ্ট্রিক সহায়তায় বাঙ্লায় ভূমি দখল ক'রে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম ও তার বাহক সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার প্রচলন করতে থাকে। এখানে ও তারা অনার্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় কর্মসূত্রে তাদের নারী পুরুষদের বশীভূত করে ও ক্রমশ মিশ্ররক্তের বাঙালী-জাতির অভ্যুদয় সম্ভব করে। হিসাবে দেখা যায়, বাঙালীরা মূখ্য ভাবে আর্য ভাষাভাষী হলেও জন্মসূত্রে এবং পরবর্তী কালে উক্ত কোল বা সাঁওতাল-খেড়িয়াদের ভাষার শব্দাবলী ও বাগবিধির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বলা যেতে পারে, অনুরূপভাবে হিন্দী ভাষী, ভোজপুরী মৈথিলী এবং ওড়িয়া-ভাষীরাও অনার্য নিষাদবর্গের ভাষার প্রভাব নিয়েছে। আরও বলা যেতে পারে যে আর্যদের মূল ভাষা 'চলিত' সংস্কৃত ও প্রাকৃত কেবল শব্দের দিক থেকেই দ্রাবিড়

ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা থেকে কালে কালে প্রভূত ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ঋণের পরিমাণ সংস্কৃত অভিধান গুলিতে স্বল্প মাত্রায় রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে লোকভাষায় আবিস্কৃত হচ্ছে। দ্রাবিড় ভাষীরা আর্য প্রভাবিত অঞ্চল থেকে দূরে দক্ষিণে বাস করছিল বা অপসারিত হয়েছিল বলে ভাষার দিক দিয়ে আত্মবিসর্জন করেনি, কিন্তু বহু পরে সাংস্কৃতের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছে, যা থেকে মুক্ত হয়ে স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস করছে ইদানীং। অপর পক্ষে পর্বতিয়া কিরাতেরা অনেকেই ক্রমশঃ তাদের মঙ্গোলীয় তিব্বতীয় ভাষা ত্যাগ ক'রে কাশ্মীর থেকে গাড়োয়াল হয়ে নেপাল পর্যন্ত স্বভাষা-প্রভাবিত আর্যভাষাকেই আপনার বলে বরণ করেছে। কিন্তু আবার স্বকীয়তাও রক্ষা করেছে এদের বহু শাখাই, যেমন আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের উপজাতীয়েরা।

বাঙলায় আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ও ক্রমাগত জাতি-বিমিশ্রণের সঙ্গে দেশের অধিনায়কত্বের ভার রক্ষা করতে লাগলেন ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের –উচ্চবর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী ও মোটামুটি হিন্দু –বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ে আগত আত্মরক্ষাকাতর হীনবর্ণীয়েরা দৈহিক শ্রমের যোগান দিয়ে উচ্চবর্ণের সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে লাগলেন। এরাই আজ থেকে দু' তিন শতাব্দী আগেও বাঙলার সংখ্যা গরিষ্ট জন। বলশালীদের রাষ্ট্রীয় ও শাস্ত্রীয় সংহতি যতই যুক্তিহীন ও অমানবিক হোক তারই জয়, এটাই যেন সর্বত্র একটা স্থায়ী নীতি। কিন্তু সে কথা যাক্। অনুমান হয়, বাঙ্লায় ভাঙা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন ও বৈষয়িক কাজ চলতে আরম্ভ করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে। হাজার বছর পর থেকে ঐ প্রাকৃত নানা কারণে নোতুন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে, অনার্য-প্রভাব যার একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই। এই পরিবর্তিত অবস্থাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'অপভ্রংশ' অর্থাৎ শিথিল, বিকৃত ও নিম্নস্তরের প্রাকৃত, কিন্তু কেবল বাঙলাতেই নয়, উত্তরভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপভাবে ভাষার এই বিকৃতি ঘটতে থাকে। আমরা অপভ্রংশ শব্দটাকে ধ'রে একে বিকৃতি বলছি, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এ হ'ল বিকাশেরই একটা পর্যায়।এই বিকাশের সূত্রই প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ স্তরের উদ্ভবের মতই, অপভ্রংশ থেকে যা জন্মাতে লাগল তাকে বলা হয়েছে প্রারম্ভিক স্তরের আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা। অর্থাৎ হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাঙ্লা, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতির আদিরূপ। এ হ'ল নবম-দশম শতাব্দীর কথা। বাঙলায় তার নিজরূপ খানিকটা ধরা পড়েছে নেপালে প্রাপ্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাংকেতিক তত্ত্বময় চর্যাগীতিকার একটি সংগ্রহ গ্রন্থের পুঁথিতে। খানিকটা কেন বলছি, 'সম্পূর্ণ' কেন বলছি না ? তার কারণ, (১) ওগুলি একেবারে মৌখিক বা চলিত ভাষার লেখা নয়। ভাষার চলিত রূপ আর লিখিত রূপে চিরকাল কিছু পার্থক্য থাকেই। এগুলিও ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যিক রূপ মাত্র এবং (২) যে পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে নানান স্থানে পাঠ-বিভ্রাটের চিহ্ন স্পষ্ট, অর্থসংগতির জন্য ঠিক পাঠ অনুমান করে নিতে হয় বহু ক্ষেত্রেই, মিলিয়ে নিতে হয় চর্যাগীতির তিব্বতী সংস্করণের সঙ্গেও স্থানে স্থানে ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ গীতিকাগুলিতে বাঙ্‌লার আনুমানিক আদিরূপ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

চর্যা গীতিকাগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীর লেখা-সিদ্ধাচার্যদের পুরো ছেচল্লিশটির গানের সমাবেশ। এর ভাষা রীতি অধ্যয়ণ করে বাঙ্‌লা ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষক ও শ্রেষ্ট আধুনিক প্রাচ্য পণ্ডিত সুনীতিকুমার একে বাঙ্‌লা ভাষার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন রূপে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ এর মধ্যে পাওয়া অতীত বাচক –ইল প্রত্যয় ও ভবিষ্যৎ-বাচক-ইব প্রত্যয়, সম্বন্ধের বিভক্তিতে –র –এর প্রভৃতি বেশ কয়েকটি লক্ষণ বাঙলারই, হিন্দীর নয়, যদিও হিন্দী অবহট্র বা অপভ্রংশের প্রভাব এতে পড়েছে। চর্যাগীতির পুঁথিটির লিপি দ্বষ্টেও মনে হয়েছে যে এর সঙ্গে পরবর্তী বাঙলা লিপির অর্থাৎ শ্রী কৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুঁথির লিপির বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। যাই হোক, একমাত্র ঐ চর্যাগীতিকাগুলি ছাড়া প্রাচীনতম বাঙলা ভাষার আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি এবং শুধু তা-ই নয়, পরবর্তী দুশ' বছর ধ'রে লিখিত কোনো পুঁথিই আমাদের হস্তগত হয় নি। এর কারণ হিসাবে অনুমান করা হয়েছে যে বখ্‌তিয়ার খিলজির তুর্কিদল (তুরুক =তুরষ্ক। বাঙ্‌লায় অশ্বারোহী সৈন্য) বিহারের মধ্য দিয়ে বাঙ্‌লা অভিযান ক'রে সব গ্রাম নগর বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল, তাই কোনো রচনা পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের অধ্যয়নে এরকম অনুমানের কোনো ভিত্তি নেই। ইতিহাস এরকম অনুমানের বিপক্ষেই যায়। শহর এবং বৌদ্ধবিহারগুলি লুণ্ঠিন হয়ে থাকবে, কিন্তু যেখান থেকে শস্যভাগরূপ রাজস্ব পাওয়ার কথা, তুর্কি-পাঠানেরা নিজস্বার্থের জন্যেই এমন গ্রাম ও জমিদারদের বিধ্বস্ত করেনি। আমাদের মনে হয় বাঙ্‌লা ভাষা তখনও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়ায়নি, তাই লিখিত রচনার অভাব ঘটেছে। ঐ সময় অনার্য সংস্রব থেকে আগত ও তান্ত্রিকতা প্রভাবিত মনসা, চন্ডী ও ধর্মঠাকুরের মৌখিক ব্রতকথা ও ছড়ারূপে অবস্থিতির পর্যায়, কাহিনী সহ লিখিত রূপ অন্ততঃ আড়াইশ' বছর পরের ব্যাপার। অন্যদিকে দেখতে গেলে, লক্ষনসেনের সময়কার কবিদের যথা জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধন প্রভৃতির সংস্কৃতে কাব্যরচনার পুঁথি অব্যাহত ভাবেই প্রচারিত ছিল। এই শূন্যতার সময়ের মধ্যে সংস্কৃতকে পাশে রেখে বাঙ্‌লা ভাষার আত্ম সংগঠনের পর্ব চলছিল নিশ্চয়ই। তুর্কি অভিযানের (১২০৩) আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে ক্রমশঃ সুশাসন প্রতিষ্টিত হলে পর ফারসী ভাষায় লেখা ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়-কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত হয়। বড়ু চন্ডীদাসের রচিত ('বড়ু' শব্দের সাঁওতালী ভাষায় অর্থে-অবৈধ প্রণয়ী) কৃষ্ণকীর্তন নামের আখ্যানধর্মী গীতিকাব্য ইউসুক –জোলেখার প্রণয়-কাহিনীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বড়ু চন্ডীদাস তাঁর বিখ্যাত কাব্যটি লেখেন আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে, শিখরভূম বা ছাতনার (=ছত্রীনাথ= ক্ষত্রিয়নাথ) জমিদারের এলাকার শালতোড়া গ্রামে। ঐ গ্রামে বেশ পুরানো ও মাথা-ভাঙা বাশুলীর (তান্ত্রিক সরস্বতীর) মূর্তি এবং আরও বহু প্রস্তর মূর্তি আজও সংরক্ষিত দেখা যায়। আর পুরানো পুঁথির রক্ষক বেশ কয়েক ঘর রজক (=রঞ্জক) সম্প্রদায়ের বসবাসও দেখা যায়।

কৃষ্ণ সন্দর্ভ বা 'কৃষ্ণকীর্তন' নাম দেওয়া কয়েক পৃষ্ঠা-হীন এই দীর্ঘ কাব্যটিতেই প্রথম বাঙ্‌লা ভাষার একটা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে, চন্ডীদাস যদি অন্ততঃ ১৪১০ খ্রীঃ মধ্যেও তাঁর কাব্য লিখে থাকেন তো এর ভাষামূর্তি হবে তার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার অর্থাৎ ১৩৫০-৮০ খ্রীঃ এর। রচনা লক্ষিত –আক্ষা, আক্ষে, তোক্ষে, মোএঁ, তোএঁ, আছিলোঁ, দেখিলাহোঁ, গেলী, পাইলী, গেলান্ত, পায়িবাক, কাহ্নাঞি, রাখোআল, কুইলী, আঅর, তভোঁ, রাতিহো প্রভৃতি হাজার সংখ্যার অধুনা অপরিচিত শব্দ সংস্কৃত-প্রাকৃত থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তিত হতে হতে ঐ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। তারপর নির্দিষ্ট পরিবর্তন সূত্রেই আমরা আধুনিকে পেয়ে থাকি- আমি, আমা, তুমি, তোমা, গেলাম, করলাম, পাইবেক, দেখিবেক, কানাই, রাখাল, আর, তবু প্রভৃতি শব্দাবলী। বাঙ্‌লা ভাষার বিবর্তনের সূত্র পাওয়ার দিক থেকে কৃষ্ণকীর্তন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও পদাবলীর রচনায় কৃষ্ণকীর্তনের সময়কার ও আধুনিক কালের মধ্যবর্তী পরিবর্তনের ধারা রক্ষিত হয়েছে।আমাদের এই ব্যাকরণ লেখার বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত বিবর্তনের দিকগুলিও আমাদের কিছু কিছু দেখিয়ে দিতে হবে। তবেই আধুনিকের রূপগুলি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে। মধ্যযুগের বিখ্যাত রচনার পুঁথিগুলিতে পরেকার পালাগায়কদের হস্তক্ষেপ জনিত আধুনিকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়লেও তারই মধ্যে বৃদ্ধি সহকারে ভাষা পরিস্থিতি বাছাই করে নেওয়া কষ্টকর নয়। বিশেষ পন্ডিতপ্রবর সুনীতিকুমারের অধ্যবসায়ের ফলে আমরা তা জানতেও পারছি। ভাষা বাঙ্‌লার আধুনিক যুগ প্রারব্ধ হয়েছে খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের সামান্য কিছু পর থেকেই। এই সময়টা আয়াস সহকারে গদ্যনির্মানের যুগ। এর আগে চিঠিপত্র লিখনে ও সহজিয়াদের নিবন্ধ লিখনে ভাঙা ভাঙা গদ্য-বাক্যের আভাস পাওয়া যায়। উনিশ শতকের একেবারে প্রথম পাদে উইলিয়াম কেরীকে বাইবেলের গদ্যানুবাদে প্রবৃত্ত দেখা যায়। তাঁকে গদ্য নির্মানে সাহায্য করেন মৃত্যঞ্জয় বিদ্যালংকার ও কদাচিৎ রাম রাম বসু। মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত শব্দ-প্রধান গদ্যরচনার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' পুস্তকের কাহিনী অংশে লৌকিক শব্দ বহুল বাঙ্‌লা গদ্যরীতির প্রতি পক্ষপাতের চিহ্নও দেখা যায়। উনিশ শতকের প্রথম পাদের দশ-বারো বছরের মধ্যে গদ্যে আরও বহু বাঙ্‌লা বই প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি ফোট উইলিয়াম কলেজের গন্ডীর বাইরেও খ্যাতি লাভ করে। বলা বাহুল্য যে বাঙ্‌লা ভাষার উদীয়মান সমৃদ্ধির জন্য অক্লান্তকর্মা সংগঠক ও সাধক উইলিয়াম কেরীকেই অজস্র সাধুবাদ দিতে হয়।

এই সময়েই বাঙ্‌লা সাধু গদ্যরীতিতে দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে পুষ্টি সাধন ঘটে রামমোহনের হাতে। তিনি তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজ সংস্কারক তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজনে বাঙ্‌লা গদ্যকে ব্যবহার করতে গিয়ে ইংরেজি গদ্যের রীতি বাঙ্‌লায় অনুপ্রবিষ্ট করেন। তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ নাম দিয়ে বাঙ্‌লার একটি ব্যাকরণও লিখেছিলেন। ঐ সময় সমাচার-দর্পন, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ-কৌমুদী প্রভৃতি কয়েকটি সংবাদপত্র সংবাদ পরিবেশন কল্পে জনসংযোগে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণের

কতকটা সুবোধ্য গদ্যরীতির প্রসার ঘটায়। বলাই বাহুল্য যে এসব তখনকার সাধুরীতির ব্যাপার। এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের আগে পর্যন্ত সাধুরীতিতে পূর্ব পূর্ব কাব্য-কবিতায় দৃষ্ট ও চলমান রীতিকে কোনো সম্মানই দেওয়া হয়নি। উনিশ শতকের এই প্রারম্ভ সময়ে স্কুল বুক সোসাইটিও শিক্ষনীয় কাহিনীমূলক আড়ষ্ট বাঙ্‌লা গদ্যে লিখিত বই প্রকাশ করতে থাকে। ফলে ১৮২০-৩০ খ্রীঃ মধ্যেই বাঙ্‌লা গদ্য লেখার অভ্যাস শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এ তথ্য সঠিক হলেও একালের পরীক্ষামূলক গদ্যনির্মানের মধ্যে একটা বড় ত্রুটি থেকেই গেছে। যার জন্য একালের যাবতীয় লেখাকে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম বলে অভিহিত করা যায় না।

উনিশ শতকের প্রারম্ভের লেখকেরা শূণ্য ভিত্তির অবস্থা কল্পনা করে কোমর বেঁধে গদ্য নির্মান করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা বিগত তিন-চারশ' বছরের পদ্য রচনার স্টাইলের দিকে মনোযোগী হ'লে অবশ্য দেখতে পেতেন উল্লেখযোগ্য কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্রাদির পদ্য নির্মাণের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে গদ্যরীতির লুকিয়ে আছে। কবিতার চরণগুলির ক্রিয়াপদ সহ অল্প কয়েকটি শব্দ একটু এদিক ওদিক করে নিলেই গদ্যরীতি দূর থেকে সাড়া দেয়। যেমন বলা চলে- 'যশোর নগর ধাম/ প্রতাপ আদিত্য নাম/ মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ' ইত্যাদি / রায়গুনাকরের রচনা সংস্কৃত-ঘেঁসা সাধু গদ্যরীতির পথ প্রদর্শক। আবার সাধু অথচ লৌকিক স্টাইলের গদ্যের সূচক হ'ল নিম্নলিখিত রূপ বন্ধন-

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।।

x x x x x x x x x

পাটনী বলিছে মা গো বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলিন জাতি সেখানে কোন্দল

x x x x x x x x x

পাটনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে।।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল।।

X x x x x x x x x x x x X

সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।।
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।

অনুরূপ কবিকঙ্কনে-

এত বলি বীর হস্তে দিলেন অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।।
একটি অঙ্গুরী হৈতে হৈব কোন্ কাম।
সারিতে নারিবে কভু ধনের দুর্নাম।।
না লইহ না লইহ চন্ডিকার ধন।
ঐ ধনের বাদে প্রভু হারাইবে জীবন।।
এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা।
ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ কৈল বাঁকা।।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে – খেয়া দেয়, মা গো, ভাল হয়ে বৈস, এ ত মেয়ে, হৈব কোন কাম, সারিতে নারিবে, ধনের বাদে, মুখ কৈল বাঁকা প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্লার স্বকীয় বৈশিষ্ট লক্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া, দেখিতে দেখিতে, হৈতে, প্রভৃতির 'ইতে' প্রত্যয়, ত, গো প্রভৃতি অব্যয়ের ব্যবহারও সংস্কৃতের অনুসারী নয়। আর সর্বোপরি ঐসব অংশের ক্রিয়াপদ গুলিকে বাক্য শেষে স্থাপন করলেই সহজ বাঙ্লা গদ্যে উপনীত হওয়াও যায়। বাঙ্লা গদ্যের এই লুকানো রূপ গোড়ার দিকে গদ্যনির্মানের অধ্যবসায়ীরা কেউই দেখতে পান নি। তবে বাঙ্লার স্বকীয় এই ব্যাপারটি অনুভূত হতেও বেশী বিলম্ব হয় নি। অনুভব করেছিলেন বিদ্যাসাগর মোটামুটি ১৮৪০ খ্রীঃ থেকেই। সংস্কৃতে শিক্ষিত হয়েও গ্রাম বাঙ্লার মাতৃভাষার শব্দ ও বাক্যের স্বরূপ তিনি ভোলেন নি তো বটেই বরং আরও অন্তরঙ্গভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। এরই কারণে, তাঁর মাতৃভাষার শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহ। বাঙ্লায় একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ করে কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরীর মধ্য দিয়ে সীতার বনবাস পর্যন্ত স্বদেশবাসীর জন্য উৎসর্গিত অবদান। তাঁর শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বিচার প্রভৃতি গ্রন্থে ও নিবন্ধে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ শব্দ কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হলেও বাঙ্লার বাক্যনির্মাণের যে একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গিমা আছে তা তিনি সর্বত্র অনুসরণ করেছেন, সংস্কৃত-প্রাকৃতের কৃত্রিমতা ও আড়ষ্ঠতাকে তাঁর বাক্যের অন্তভূক্ত করেন নি।একই সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃতের প্রকৃতি-প্রত্যয় সমন্বিত শব্দাবলী ও সমাসবদ্ধতা প্রভৃতি পরিহার করে যথাসাধ্য সরল বাক্রীতির দিকেই আগ্রহ দেখান। বাঙ্লা গদ্যরীতির এই দ্বিতীয় পর্যায়েই মৌখিক ভঙ্গিমার দিকে কারও কারও আগ্রহ পরিস্ফুট হয়, এবং যদিও তা স্থায়ী হয় নি, তবু তার অন্তর্নিহিত সহজত্বের একটা প্রভাব পরবর্তী সাহিতিকদের চিত্তে থেকেই যায়। প্রয়োজনমত সংস্কৃত-খেঁসা শব্দ নিয়ে তাকে লৌকিক বাঙ্লায় স্বকীয় স্টাইলের মধ্যে মিশিয়ে সর্বাধুনিক যিনি পথনির্মান করলেন, তিনি হলেন একাধারে কল্পনাপ্রবণ ও মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি

যা করলেন তা মুখ্যভাবে আজ পর্যন্ত বাঙ্‌লা গদ্যের সাধুরীতির স্টাইলকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অনুগামী হয়েই বাঙ্‌লা গদ্যকে অধিকতর সাহিত্যিক ঐশ্বর্যে মন্ডিত করেছেন। আর শরৎচন্দ্র আকাশবিহারী কল্পনার পথ পরিত্যাগ করায় বঙ্কিমী রীতি থেকে মর্মের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়েও লৌকিক সারল্যের পথ বেছে নিয়েছেন। বিভূতিভূষণ-মুখোপাধ্যায়-বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি রথীরা ও বঙ্কিম প্রদর্শিত আন্তঃ সরলতার পথই ধরেই চলেছিলেন। অবশ্য আলালের ঘরের দুলালের আধাচলিত ভাষার সপক্ষতা করেও বঙ্কিম সে পথে যান নি। তিনি দেখেছিলেন তখনও চলিতের পদক্ষেপ বিশৃঙ্খল, মৌখিকতা-দৃষ্ট। তা সাহিত্যের ভাষা তখনও হতে পারছে না। 'চলিত' কেও আদর্শ চলিত হওয়া চাই, শিষ্ট বা শিক্ষিতের গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই, তবেই লেখার গদ্যে তার প্রতিষ্টা মেনে নিতে কারুর বাধা থাকবে না।

কিছু পরেই কিন্তু এই অভিনব কান্ডটাই সার্থক ভাবে ঘটে গেল। ঘটল রবীন্দ্রনাথ ও তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দের হাতে। কিন্তু তবু এঁরা কেউই তখনও সাহস করে চিঠিপত্র, ডায়েরি, ভ্রমণ কাহিনী ছাড়িয়ে মনন প্রধান গদ্যরচনায় চলিতকে শিরোধার্য করতে পারেন নি। এই সাহস ও শক্তির পরিচয় রাখলেন প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ খ্রীঃ থেকে।বাঙ্‌লা গদ্যের সূচনা পর্ব থেকে ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে কিছুটা কৃত্রিম ঐ সাধুরীতির প্রভাব-প্রতিপত্তি কাটিয়ে মৌখিকের সগোত্র অথচ অভিজাত 'শিষ্ট্যের চলিত এখন সমারোহে আত্ম ঘোষণা করলে এবং তার আকর্ষণ এমনই লোভনীয় হ'ল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তারই গলায় বিজয়মাল্য অর্পণ করলেন। ক্রমে বর্তমানে সাধুরীতির ক্ষেত্র নিতান্ত সংকুচিত হয়ে এসেছে, এমনই মাত্রায় যে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও আর সাধুরীতির দিকে ঘেঁষতে রাজি নয়। আমরাও সেই কবে কলেজ-অধ্যায় থেকেই সাধুপথ ত্যাগ করে বসে আছি।

কিন্তু কথা এই যে, চলিত রীতি কি সাধুরীতি থেকে এতটাই ভিন্ন ও সহজ যে তার অধিকার এত দ্রুত একচ্ছত্র হয়ে পড়ল? এই কারণ, অবশ্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে এবং চলিতের শক্তির উৎস ঠিক কোনখানে তাও বোঝা প্রয়োজন। 'চলিত' নিঃসন্দেহে মৌখিকের ভিত্তির উপর গঠিত। এই মৌখিক বাঙ্‌লার যে কোনো স্থানের নয়, যে কোনো জনবসতির নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও বিশেষভাবে কলকাতা-কেন্দ্রিক শিক্ষিত জনের। এই বুলিতে শিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিতের বিশিষ্ট বাক্-রীতির শাসন রয়েছে বলেই বলা হয়েছে 'শিষ্ট চলিত'। হিসাবে দেখা যায় এটি গেঁয়ো মৌখিকের উপর পালিশ লাগানো নয়, তৎসম শব্দ ও সাধু রীতিকে মান্য করা মৌখিক। এই চলিতই ব্যবহার্য ভাষা রূপে মানিত বা স্বীকৃত হয়েছে বলে অধুনা কেউ কেউ এর নাম করতে চান 'মান্য' চলিত। যাই হোক, বাইরে থেকে প্রাথমিক ভাবে যা লক্ষনীয় তা হল উচ্চারণ ও সুবিধার জন্য সাধুরীতিতে প্রচলিত বহু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের মাঝের অংশের স্বর ও ব্যঞ্জনের সংকোচন বা বিমিশ্রণ। যেমন- করিল = করলে, করিয়াছিলে = করেছিলে, করিতে = করতে, করিয়া = করে,

করিবে, করিবেক = করবে, দিগের = দের ইত্যাদি। যদিও করিতেছে'র 'ইতে' লোপ পেয়ে করছে প্রভৃতি হয়নি। করছে, বলছ, শুনছে-এসব বহু আগে প্রচলিত করিছে, বলিছে, শুনিছে প্রভৃতিরই সংক্ষেপ। এর বেশ কয়েকটিই অপিনিহিতি এবং তার পরেকার অভিশ্রুতির ফল। অন্যদিকে সর্বনামে- তাঁহা =তাঁ, তাঁহারা = তাঁরা, তাহাকে = তাকে, তাহাদের =তাদের, ইহাদের = এদের ইত্যাদি। বলতে গেলে এসব উচ্চারণের সুবিধা ও সংক্ষেপের জন্য । কিন্তু এরকম সংক্ষেপকরণই চলিতের একমাত্র লক্ষণ নয়, তা, ত (তো), না, বা, কি, বই, লেগে, দিয়ে, বলে প্রভৃতি অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ, ভিন্ন শব্দযোগে ক্রিয়ার অর্থান্তর, যেমন- মেরে ফেলা, ছুঁতে দেওয়া, চাল মারা, চাল দেওয়া, চুকলি কাটা, মুখ করা, মুখ চাওয়া ইত্যাদি শতাধিক জনমুখসৃষ্টি রূপক-সংস্কৃতিক প্রয়োগে চলিত রীতি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এক একটা ক্রিয়াপদেরই কত অজস্র প্রয়োগ বৈচিত্র। আবার সর্বোপরি রয়েছে বাক্যগঠনের ভঙ্গিমা। কোন ক্ষেত্রে কোন পদ ঠিক কোন স্থানে বসালে সঠিক অর্থবোধ ঘটবে বা জোর দেওয়া হবে তা বুঝে নিয়ে বাক্য প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে জনসাধারণের মৌখিক ভাষা লিখিত রীতির প্রতি উদাসীন হয়েই নিজ পথে চলমান হয়েছে, সংস্কৃত বাক্যরীতি বহুল পরিমাণে উলঙ্ঘন করেছে আত্মপ্রকাশেরই প্রয়োজনে। অবশ্য সাধু গদ্যে এবং তারও আগে লেখা পদ্য সাহিত্যে বাঙ্লা বাক্য সংস্কৃত-প্রাকৃতের বাক্যের বন্ধন ত্যাগ করে সুনির্দিষ্ট সোজা পথ নিয়েই ফেলেছে। অনার্য প্রবণতায় আবিষ্ট হয়েছে। চলিতে সেই বাক্য রীতিরই বৈচিত্র্যসহ অধিকতর ভাবদ্যোতকতার প্রয়াস লক্ষনীয়। কলকাতা-কৃষ্ণনগর কেন্দ্রিক শিক্ষিতের মুখের এই চলিতই ক্রমে বাঙ্লায় পশ্চিম-দক্ষিণ-উত্তরের জনগনের ভাষাকে প্রভাবিত করে চলেছে।সাহিত্য ও ভাষার এই অতিসংক্ষেপ ও সাধারণ ইতিবৃত্ত নির্দেশের পর এই প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ বাঙ্লা ব্যাকরণের প্রকৃত সমস্যার মধ্যে আসছি।

বিভিন্ন অঙ্গসহ গোটা ভাষাটার ধ্বনি ও রূপ বিশ্লেষণ করে সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার ব্যাকরণের কাজ। লক্ষনীয় ব্যতিক্রম থাকলে তাও ব্যাকরণে নির্দিষ্ট থাকার নিয়ম। বিশ্বের প্রতিটি মুখ্যভাষাই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। পন্ডিতবর্গ সে সব ভাষার মূল স্বরূপ অধ্যয়ন ক'রে দেখেছেন, কোনোটির রূপ-পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় শব্দের ভিতর থেকে, কোনোটিতে শব্দে শব্দে জোড়া লেগে যায়, কোনোটিতে মূল শব্দানুর সঙ্গে বাইরের শব্দানুর যোগফলে বহু নোতুন শব্দ উৎপন্ন হয়ে যায়। কোথাও বা ভাষা শব্দে শব্দে সংশ্লেষের বিরোধী,শব্দগুলিকে পৃথকই রাখতে চায়, কিন্তু দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরিশেষে জোড় শব্দে পরিণত করতে বাধ্য হয়, এইরকম বহু মৌল বিভেদ আছে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার।

আমরা যে ভাষা ব্যবহার করে থাকি, তার মূল প্রকৃতি ধাতু প্রত্যয়াত্মক হলেও কালক্রমে তাতে ভিন্ন প্রকৃতির ভাষার প্রভাব এসে লেগেছে, স্বকীয় উচ্চারণের নানান পরিবর্তন বা বিকাশের অবস্থা ঘটেছে। এই সব পরিবর্তন নিয়ে কালক্রমিক আলোচনা থাকে ভাষাবিজ্ঞানের

বইয়ে। তবু ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ব্যাক্যরণকেও ব্যাখ্যা করে নিতে হয়। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙ্‌লায় রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে প্রায় তিন হাজার বছর কেটেছে। এই সময়ের মধ্যে সংস্কৃতের পাণিনির আগে পরে লেখা বেশ বেশ কিছু ব্যাকরণ, প্রাকৃতের ব্যাকরণ, আধুনিক ভারতীয় ভাষা অর্থাৎ বাঙ্‌লা, হিন্দী প্রভৃতির বহু ব্যাকরণ লেখা হয়ে গেছে, যেগুলিতে সেই সেই সময়কার প্রচলিত ভাষারূপ নিয়ে পর্যালোচনা ও বিবিধ নিয়মের আবিষ্কার করা হয়েছে। বাঙ্‌লাতেও আঠারো শতাব্দীর শেষে হ্যালহেড্-এর ব্যাকরণ, উনিশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে উইলিয়াম কেরীর ব্যাকরণ নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায়। এর একটু পরেই একালের সবচেয়ে উল্লেখ্য বই লেখেন রামমোহন, আখ্যা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বাঙ্‌লায় পঞ্চাশটির মত ব্যাকরণ লিখিত হয়েছে, যার মধ্যে বিখ্যাত হল নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, সুনীতিকুমার, বসতকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রমুখের ব্যাকরণ। বিদ্যাসাগর বাঙ্‌লা ব্যাকরণ লেখেন নি, কিন্তু বাঙ্‌লার পক্ষে পরোক্ষভাবে আরও বড়ো কাজ করেছিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজ করে দিয়ে –উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী লিখে। পরবর্তী কালের সংস্কৃতানুগ বাঙলা ভাষায় স্বরূপ পরিস্ফুট করতে ব্যাকরণ কুমুদীরই অনুসরণে বাঙ্‌লা ব্যাকরণের অধ্যায় বিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবে আজও তার অনুবর্তন চলেছে।সাধু রীতির পর গত ষাট-সত্তর বছর আগে চলিত স্টাইলের প্রারম্ভ এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রমশঃ বহুলতর প্রচলনের ফলে চলিতের জন্য পৃথক ব্যাকরণ নির্মান খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তবু সে প্রসঙ্গে এ কথা মনে না রাখলেই নয় যে কেবল চলিতের ব্যাকরণ সম্যক ব্যাকরণ হতে পারে না। কারণ তৎসম শব্দাবলী ও কচিৎ সাধুরীতির ভঙ্গিমার অনুবর্তন চলিতে আজও চলেছে, বরং শিক্ষিতের হাতে কখনও কখনও একটা বক্র ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে তৎসম শব্দ ও সাধুরীতির প্রভাব বেড়েছে বই কমেনি। প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু, বিবেকানন্দ প্রদর্শিত মৌখিক-সংলগ্ন চলিত যখনই 'শিষ্ট' চলিতে রূপান্তরিত হয়েছে তখনই ব্যকরণের দিক দিয়ে তৎসম ও সাধুকে মান্য করার প্রয়োজন নির্ধারিত হয়ে পড়েছে। দেখতে গেলে শিষ্ট জনের লিখিত চলিতের তো বটেই, মৌখিক চলিতেরও দু'মুখো রীতিকে মান্য করে তবেই পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা সম্ভবপর। ইংরেজীতে এই পৃথক দু'রীতি নেই। ইংরেজী ব্যাকরণ গ্রামে-গঞ্জে প্রচলিত সাধারণের প্রকট মৌখিককে সমাদর করে নি, লিখিতের সঙ্গে প্রায় একীকৃত শিষ্ট মৌখিককে মান্য করেছে। বাঙ্‌লায় তৎসম শব্দের এখনও প্রবল প্রতাপ হেতু চলিত প্রবণতাকে অগ্রবর্তী রেখে প্রাচীন রীতিকেও ব্যাকরণে মান্য করতে হবে।

নিরূপায় হয়ে ব্যাকরণের এই দ্বৈতকে মেনে নিয়ে নিম্নলিখিত অধ্যায় বিভাগ গুলির মধ্যেই প্রাচীন ও নবীনকে সমীকৃত করে নিতে হবে!

১) (ক) ধ্বনি ও বর্ণ, বর্ণ ও অক্ষর, বর্ণ ও হরফ, সংস্কৃত প্রাকৃত থেকে বাঙ্‌লার উচ্চারণের পার্থক্য। বাঙ্‌লায় স্বর ও ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ। বাঙ্‌লায় বর্জিত সংস্কৃত স্বর ও ব্যঞ্জন। নব-

আবির্ভূত স্বর-ব্যঞ্জন।

বাঙ্‌লায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বহুল পরিবর্তনের সূত্র। সাধুরীতির সঙ্গে চলিত রীতির উচ্চারণ ও লিখনে পার্থক্য।

(খ) বাঙ্‌লার উপভাষাগুলি ও শিষ্ট চলিতের সঙ্গে সেগুলির পার্থক্য।

(গ) বানান। নত্ব-ষত্ব, হলন্ত –হসন্ত, হ্রস্ব-দীর্ঘ, শ-স, ঙ-ং, ত-ৎ প্রভৃতি। যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ।

২) (ক)শব্দ। মৌলিক- যৌগিক। (খ) ধাতু ও প্রত্যয়, শব্দ ও প্রত্যয়, অনুকার শব্দ প্রভৃতি। উপসর্গ।

শব্দদ্বৈত তার বিভিন্ন রূপ। শব্দ- বৈচিত্র্য।

৩) (ক) বাক্য ও পদ। শব্দের সঙ্গে পদের পার্থক্য। পদ-বৈচিত্র্য। পদ-প্রয়োগের বৈচিত্র্য। পদের রীতি সিদ্ধ প্রয়োগ।

(খ) কারক। কারক-বিভক্তি। অনুসর্গ। কারকের প্রয়োগ বৈচিত্র্য।

(গ) ধাতু ও ক্রিয়া। ক্রিয়া বিভক্তি, ক্রিয়াপদ, ক্রিয়ারূপ। চলিত ও সাধুর পার্থক্য। ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য। ক্রিয়ার কাল ও ভাব। যৌগিক ও সংযোগমূলক ক্রিয়া। ক্রিয়া-বিশেষ্য, ক্রিয়া-বিশেষণ।ক্রিয়ার রূপক-প্রয়োগ।

৪) সমাস।

৫) (ক) বাক্যঃ বাক্য নির্মাণে বাঙ্‌লার-স্বকীয়তা। পদ স্থাপনের বৈচিত্র্য। গঠন-ভেদ। বৈচিত্র্য বাক্য রূপ-পরিবর্তন।বাঙ্‌লা বাক্যে ইংরেজী প্রভাব। সাঁওতালী প্রভাব। গদ্যের বাক্য ও পদ্যের বাক্য।

(খ) গদ্যের স্টাইল।

(গ) ছন্দ।

(ঙ) অলংকার।

ব্যাকরণ- চর্চায় রবীন্দ্রনাথ

মানুষের ভাষা স্থিতিশীল জড়ধর্মী নয়, নদীর প্রবাহের মতই অথবা মানুষের জীবনধারার মতই গতিশীল, সদাচঞ্চল। নদীর সঙ্গে পার্থক্য এই যে, ভাষাপ্রবাহের আদি-অন্ত চিহ্নিত করা যায় না। মানুষের আদিতম অবস্থায় পরস্পর-বোধ্য ধ্বনি-সংকেত দিয়ে হয়ত বা এর প্রারম্ভ (সংস্কৃত বা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার ধাতু ও প্রত্যয় স্মরণীয়), কিন্তু এর অন্ত্যতম, এমনকি বর্তমানের পরবর্তী অবস্থাও অনির্ণেয়। কারণ, এতে যোগ বিয়োগ প্রভাব মিশ্রণ প্রভৃতি ঘটছে অহরহ এবং আমাদের লক্ষ্যের অগোচরেই। বেশ কিছুকাল কেটে না গেলে সাময়িকভাবে স্থায়ী ঐ সব পরিবর্তন শ্রোতা ও দ্রষ্টার কাছে ধরা দেয় না। ভাষাবিষয়ক আলোচনার একটা দিক হ'ল তা যেমনটি আছে বা যেকালে যেভাবে চলছে তার প্রকৃতি নির্ধারণ। বলা যেতে পারে, তাৎকালিক ভাষার রূপচর্চা বা অবয়বের বিশ্লেষণ। নদীর উপমা ধ'রে বলা যায়, প্রবাহের স্রোত-পথ, বাঁক নেওয়া, আবর্তসৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষ্য করা এবং লক্ষ্য ক'রে একটা নিয়মনীতি উপস্থাপিত করা, যাতে বক্তা ও লেখক উল্টো-পাল্টা ও ভুলভাল না করে। কারণ, ভাষায় যথেচ্ছাচার ঘটলে লোকযাত্রা বিঘ্নিত হয়। বলা যায়, এটি ভাষার পরিচিতি ও ব্যাকরণের দিক। এ বিষয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। কিন্তু ভাষার অধ্যয়নের অন্য একটি দিকও আছে। কৌতূহলী ব্যক্তি কেবল রূপচর্চা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। তিনি ভাষার প্রচলিত রূপগুলো কীভাবে এল, তার আগেকার অধ্যায়ে কী ছিল, কী ছিল তারও আদিতে – এসব ইতিবৃত্তের সন্ধানে শ্রম নিয়োগ করেন। এটি হ'ল মৌল তত্ত্বের দিক, ভাষার বিবর্তনের অধ্যয়ন। এরই ফলে সংস্কৃতের সঙ্গে ইরানীয় তথা ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির বিস্ময়কর সগোত্রতা নির্ণীত হয়েছে। আমাদের ব্যাকরণে রূপচর্চা দিকটাই যদিচ বেশী প্রয়োজনীয়, তবু স্থানবিশেষে ঐতিহাসিক বোধ চলিত বাস্তবের বোধকে আরও পরিপুষ্ট ও সঠিক করতে পারে, এই কারণে বাস্তব স্বরূপের বিশ্লেষণেও স্থানে স্থানে ইতিহাস-অনুগত ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ আবশ্যক হয়ে থাকে। যেমন বলা যায়, কোনো উৎসুক ব্যক্তি বলতে পারেন যে, ক্রিয়াপদে পুরুষবাচক পৃথক্ পৃথক্ বিভক্তি থাকাই সঠিক এবং সেই অনুসারে নিয়ম পাচ্ছি- সামান্য বর্তমানে করি, কর, করে; অনুজ্ঞায় করি, করো, করুকঃ সামান্য অতীতে করিলাম, করিলে, করিল; কিন্তু সেই সঙ্গে

প্রশ্ন করতে পারেন যে ভবিষ্যতে কেন এর ব্যতিক্রম? কেন করিব, করিবে, করিবে? তখন এর আগেকার রূপে যেতেই হয় এবং দেখাতে হয় যে কিছুকাল আগেও ছিল করিব, করিবা-করিবে এবং করিবেক। দ্রুতগামী এবং সহজিয়া কোলকাতার ভাষা এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে। প্রয়োজনে আরও পিছনে যেতে হবে এবং দেখাতে হবে যে অতীত-বোধক এবং ভবিষ্যৎ-বোধক ইল্ল-অল্ল এবং ইব্ব-অব্ব প্রত্যয়জাত ক্রিয়াগুলি বাঙলা ভাষার প্রারম্ভে কর্মবাচ্যের ও বিশেষণধর্মী ছিল। যার ফলে তিন পুরুষেই রূপ ছিল করিল-করল এবং করিব-করব। লোকভাষা নিজ প্রয়োজনবশে আপনা থেকেই পুরুষগত পার্থক্য চিহ্নিত ক'রে নিয়েছে। করিলেক করিবেক প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি নয়, কোনো বৈয়াকরণেরও নয়, তা লোকমুখে সৃষ্ট। কালক্রমে যদি অতীত ও ভবিষ্যতের দুই পুরুষে ক্রিয়ারূপের একীকরণ হয়ে পড়ে এবং তাতেও যদি অর্থবোধের বাধা না ঘটে তাহলে আপাতত তা-ই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যেমনটা হচ্ছে সংবাদপাত্রিকদের শৈথিল্যে-করলে, দিলে, পেলে (প্রভৃতি সকর্মক) এবং গেল, চল্‌ল্‌, নাচল (প্রভৃতি অকর্মক) ক্রিয়া রূপের একীকরণে। বর্তমানের পরিস্থিতি ঠিকমত বোঝাতে গেলে কখনো-সখনো ইতিবৃত্তে যাওয়া আবশ্যক হতেই পারে। আবার, কোনো প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন টলটল এবং টলমল, চকচক এবং চকমক, খিটখিট এবং খিটমিট এসব ক্ষেত্রে শব্দের দ্বিত্বকরণে মাত্র একটি ব্যঞ্জনের রূপান্তরে অর্থের পরিবর্তন কেমন ক'রে সম্ভবপর হল, কেমন ক'রে চটপট এবং ঝটপট এই দুই প্রায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার চলে, ঝকঝক এবং ঝর-ঝর-এ একটা ব্যঞ্জন বদল করে নিতেই মানে একেবারে উল্টো হয়ে গেল-তখন তাঁকে একথা বোঝাতেই হয় যে ঐগুলি দুই শব্দের যোগও নয়, আর আমাদের সৃষ্টিও নয়। এগুলি বাঙালীর জন্মলগ্ন থেকে অনার্য অর্থাৎ কোলমুণ্ডা-সূত্রে গোটাগুটি পাওয়া শব্দ, আমরা মিলিয়ে জোড়া গাঁথিনি। ঐগুলি এবং ঐরকম হাজার অনুকার-জাতীয় শব্দ কোল-মুণ্ডাদের ব্যবহারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থের দ্যোতনা করত এবং হয়ত বা তাদের আদিম ব্যবহারের অধ্যায়ে ঐগুলি খাঁটি জোড়-শব্দ এবং ধ্বনিবাহিত অর্থবোধকই ছিল, কিন্তু আজ আর তা ধরবার কোনো পথই নেই। সুতরাং যাবতীয় ব্যাকরণেরও মূলে রয়েছে গতিশীল ভাষার একটা ইতিবৃত্ত। ঐসব বিচিত্র ভাববহ ধ্বনি-শব্দগুলি আমাদের অনার্য জন্মসূত্রে আমরা সরাসরি পেয়ে গেছি, এবং আমাদের রূপান্তরিত ক'রে নেওয়ার অনুকরণাত্মক প্রয়াস দু'চারটে ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নয়। সুতরাং ব্যাকরণ-নির্মাণে আমরা প্রচলিত রূপটারই চর্চা করব, কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ববতী অবস্থার মধ্যে সঞ্চরণও আমাদের অনিবার্য হয়ে উঠবে। উদাহরণে, প্রকৃতিতে, প্রত্যয়ে, বিভক্তিতে যেসব অসামঞ্জস্য বাইরে দেখা যায়, মর্ম অনুসন্ধানে তার সুসমাধান পাওয়ারই সম্ভবনা। এই কারণে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতকুমারই আজ পর্যন্ত বাঙলা ব্যাকরণের সব থেকে উল্লেখ্য রচয়িতা এমন মনে করা যায়, যদিচ একথাও ঠিক যে নোতুনতর অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতার অবসরও এরই মধ্যে ঘটে

চলেছে।

শব্দাসক্তি কবিচরিত্রের সাধারণ ব্যাপার। অনুমান করা যেতে পারে যে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার সময় থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই ব্রজবুলির সুমধুর অথচ আধা-স্পষ্ট শব্দগুলির উপর কবির আসক্তি ঘটে। পরে যখন তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় পদরত্নাবলী নামে বৈষ্ণব পদ-সংকলন প্রকাশ করেন (১৮৮৫) তখন ব্রজবুলিতে তথা মধ্যযুগের অন্যান্য কবিতায় প্রযুক্ত কয়েকটি শব্দের অর্থ ও উদ্‌ভব বিষয়ে সমুৎসুক হন। এদিকে প্রথম বিলাতযাত্রার সময় থেকে ইংরেজি ও বাঙলার উচ্চারণের সঙ্গে লিখনের ও বানানের পার্থক্য তাঁকে প্রশ্নাকুল ক'রে তোলে। এইভাবে ক্রমে লৌকিক বা চলিত বাঙলার ধ্বনি, উচ্চারণ, শব্দবলী ও প্রত্যয় প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সংস্কৃতরীতি থেকে পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এসব বিষয়ে তাঁকে গভীর চিন্তায় নিয়োজিত ক'রে, যার ফল সাধনা পত্রিকায় স্বরব্যঞ্জনের উচ্চারণ ও শব্দের রূপতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা (খ্রীঃ ১৮৯২ থেকে)। এ ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি সেখানকার সভায় এসব বিষয়ে বেশ কয়েকটি ভাষণও দেন, যেগুলি পরে শব্দতত্ত্ব নামক পুস্তিকায় গ্রথিত হয়ে প্রকাশ পায়। এ কালের এই সব অধ্যয়ন মনে রেখে এবং তার উপর সংগৃহীত আরও কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে কবি শেষ বয়সে লেখেন 'বাঙলা ভাষা পরিচয়' নামে একটি অসামান্য পুস্তিকা। যে মনস্তত্ত্ব কবিকে লৌকিক অর্থাৎ অ-সংস্কৃত বাঙলার ব্যাকরণ ও স্টাইলের দিকে আকর্ষণ করে তা হ'ল লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর ব্যাপক আগ্রহ, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির যাবতীয় সম্পদ সমাহরণ ক'রে লৌকিক বাঙলার স্বকীয় রীতির মধ্যে উক্ত অভিজাত সম্পদের স্বচ্ছন্দ প্রকাশই তাঁর সাহিত্যিক কৃতীত্ব। তাঁর বাঙলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত উপাদানের বাহুল্য প্রত্যক্ষ করা গেলেও লৌকিক ভাষারীতিকে তিনি কুত্রাপি লঙ্ঘন করেন নি এবং সেই কারণে অন্তত ভাষার দিক দিয়ে তিনি কুত্রাপি দুর্বোধ্য নন। আর এও লক্ষণীয় যে কৃষক ও বাউল-সংসর্গের অধ্যায় থেকে আরম্ভ ক'রে পরিণামী কবি-মনীষীর অন্তজীবন সাধারণ জনের অভিমুখেই এগিয়েছে। সুতরাং বাঙলা ভাষার শিল্পীকরণে সংস্কৃতের সহায়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেও কবি লৌকিক বাঙলার শক্তিসামর্থ্য সংরক্ষণে আগ্রহী হয়েছেন।

শব্দতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাগুলিতে দেখা যায়, লৌকিক বাঙলায় লেখা পদাবলীতে ও কবিতায় এবং ঘরোয়া ভাষায় অন্তরঙ্গ আলাপে আমরা যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি ও শব্দ ব্যবহার করি তার নিরূপক ব্যাকরণ তখনও লেখা হয়নি। তিনি স্পষ্টভাবেই জানালেন যে বহু স্বর-ব্যঞ্জনের সংস্কৃত থেকে পৃথক্ উচ্চারণ বাঙলার মৌল চারিত্র্য। বহু শব্দের গঠন ও প্রয়োগভঙ্গি বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তিনি স্পষ্ট্যক্ষরে বললেন- "প্রাকৃত বাঙলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।" অন্য আর এক স্থানেও জোর দিয়ে বললেন-"কেবল তাঁহাদিগকে (অথাৎ যাঁরা বাঙলা ব্যকরণকে

সংস্কৃতের সগোত্র ব'লে মনে করেন) এই অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙলা ভাষা বাঙলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা শাসিত নহে।" রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পূর্বে যা লিখে গেছেন তার মূল্য আজকের দিনে আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি এবং সেইসঙ্গে মনে করি যে বাঙলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অংশ শতকরা চল্লিশ ভাগও হয় কিনা সন্দেহ। কতকগুলি ধাতু, প্রত্যয়, শব্দনির্মাণ, ণত্ব-ষত্ব এবং সমাস বন্ধনের মধ্যেই তা পর্যাপ্ত। কারকে, বিভক্তিতে, বচনে, লিঙ্গ নির্মাণে, অব্যয়াদির ব্যবহারে, নূতনতর প্রত্যয় ও উপসর্গাদির ব্যবহার এবং সর্বোপরি বাক্য গঠনের স্বাতন্ত্রো বাঙলা তথা হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছে বহু আগে থেকেই। এর কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, মূল ভারতবাসীরা অনার্যগোত্রের মানুষ। আর্যদের রাষ্ট্রিক বিজয়ের সঙ্গে ভাষাবিজয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অনুসিদ্ধান্তরূপে ঘটলেও উত্তরভারতের মানুষের ভাষাভঙ্গিমায় ও সংস্কৃতিক আচরণে কোল-মুণ্ডা সংস্কার বহুল পরিমাণে থেকেই গেছে, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীদের মধ্যে সংস্কৃতের কমবেশি প্রভাব সংলগ্ন হয়েছে মাত্র। উত্তরভারতে মূল আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের মিশ্রণে যাঁরা আর্যগোত্রের হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্যিক কীর্তি অবশ্য বিস্ময়কর এবং ভারতবর্ষকে তা অসামান্য গৌরবের অধিকারী করেছে, আর বাঙলা হিন্দী প্রভৃতির ভিত-কাঠামোয় সংস্কৃত-বাক্ এর মৌলতা অবশ্য স্বীকার্য হলেও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, পরভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বলশালী হলেও ভারতীয় জনগোষ্টীর মানস-প্রকৃতিতে ও দৈহিক সজ্জায় তার অনার্যতা এখনও বেশ ভালোভাবেই পরিস্ফুট রয়েছে। বস্তুতঃ বাঙলা-হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা প্রচুর অনার্য সম্পদ বহন ক'রেই আত্মপরিচয় ঘোষণা ক'রে চলেছে, স্বগোত্রতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়নি।

বাঙলা ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ গ্রন্থে আমরা সংস্কৃত ভাষারীতির বিশ্লেষণ যে পরিমাণে পেয়ে থাকি সে-পরিমাণে স্বকীয় ভাষাগোত্রের পরিচয় যে পাই না, তার কারণ, ঐ কোল-মুণ্ডা গোত্রের বহুশাখায়িত আদিম ভাষাগুলির কোনো লিখিত অন্তর সংরক্ষিত উপাদান নেই, আর, দ্বিতীয় কারণ, এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আমাদের প্রবল ঔদাসীন্য। মানুষ তার সাধারণ স্বভাবে রক্ষণশীল, এমন কি শিক্ষিতেরাও নূতন কোনো ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ। নতুবা কোল-মুণ্ডাদের অধুনা-প্রচলিত ভাষার পরিচয় স্মরণীয় মিশনারি সাহেবদের উদ্‌যোগে ও আয়াসে, তাঁদের লেখা অভিধান ব্যাকরণ অনুবাদ প্রভৃতিতে কিছু পরিমাণে পরিস্ফুট হলেও আমরা ও-বিষয়ে আগ্রহশীল হইনি। যে-যে বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাঙলা ব্যাকরণের ভিন্নতা, সেগুলির মূল অনুসন্ধান করতে গেলেই কোল-মুণ্ডা শাখার ভাষাগুলির দিকে নজর দিতেই হয়। তার অভাবে যা ঘটেছে ও ঘটছে তা হ'ল কাল্পনিকভাবে দেশজ শব্দ ও প্রত্যয়াদির সংস্কৃতমূল নির্ধারণের প্রয়াস। এর হাস্যকরতা বর্তমানে আমাদের কাছে অল্পস্বল্প পরিস্ফুট হচ্ছে বটে, কিন্তু কোলমুণ্ডারী ভাষাগুলির সঙ্গে পুর্ণাঙ্গ পরিচয়ের অভাবে ঠিকমত কৃতকার্য হওয়া যাচ্ছে না। সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই আমাদের কাছে ভাষার

বিভিন্ন দিকে বাঙলার মৌলিকতার দিকটি ধরিয়ে দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সংগ্রহ করার জন্য তাত্ত্বিকদের কাছে আবেদন জানালেন। তবু তাঁর অনুপ্রেরণার মর্যদা রক্ষা করতে এখনও আমরা সচেষ্ট হলাম না। এখনও আমাদের রক্ষণশীল মস্তিষ্ক খাঁটি বাঙলা অর্থাৎ অনার্যমূল শব্দ প্রত্যয় বাগভঙ্গিমাগুলিকে টেনেবুনে সংস্কৃতের সঙ্গে আবদ্ধ করাতেই নিয়োজিত থাকছে। এর প্রতিকার না হ'লে বাঙলা ভাষার যথার্থ ব্যাকরণ আমরা পাব না। ভুল ধারণা নিয়েই তৃপ্ত থাকব। বলা বাহুল্য, সুনীতিকুমারের মত স্মরণীয় ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যদিচ বাঙলায় মৌল সংস্কৃতের অধিকারের সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট অনার্য অধিকারের বিষয়টিও অনুমান করলেন, তবু অনেক কিছুই যে তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল না তার কারণও বোধহয় ঐ একটাই, কোল মুণ্ডা ভাষার সঙ্গে গভীর পরিচয়ে অভাব। তাহ'লেও একমাত্র তিনিই নানাক্ষেত্র এ বিষয়ে সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে গেছেন, ভূমিকা প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন। প্রত্যন্ত পূর্ব-উত্তরবঙ্গে কিরাত অর্থাৎ ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাবের বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়াও তাঁর উল্লেখ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরই পরিচয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিষয়টি আজও উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানের ডিগ্রী নিয়ে যারা বেরিয়ে আসছেন তাঁরা আজও রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের প্রারম্ভ সম্পূর্ণ করতে উদ্‌যোগী হচ্ছেন না। বাঙলা মৌলভাবে সংস্কৃতজাত হলেও সর্বাঙ্গে নয়, এতে অনার্যমিশ্রণ যেমন যথেষ্ট, তেমনি রাষ্ট্রপরিবর্তনের সূত্রে আরবী-ফারসী, পোর্তুগীজ-ইংরেজি প্রভৃতির উপাদানও কিছু রয়েছে। আর আমাদের আধুনিক গদ্যরচনায় বিশেষভাবে ইংরেজি বাগভঙ্গিমার প্রভাবও সুস্পষ্ট। এসব দিক মনে রেখে বাঙলা ব্যাকরণকে কেবল সংস্কৃতের নিয়মের অধীন দেখলেই চলবে না। ভাষা-বিমিশ্রণের ফলাফলের দিকটিও সমভাবে বিচার্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের একাধিকবারের বক্তব্যে ও ভাষাচিত্র-গ্রন্থনে বাঙলায় মৌলিকতার অনুকূলেই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হয়েছে।

এখন বাঙলা ব্যাকরণের মূখ্য যে ক'টি বৈশিষ্ট্যর দিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

শব্দতত্ত্বের প্রথম নিবন্ধে তিনি দেখালেন যে ইংরেজির মতই বাঙলায় আমরা যা উচ্চারণ করি, বানানে সর্বত্র তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙলায় 'অ'-এর উচ্চারণ সংস্কৃত থেকে ভিন্ন, তাছাড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেই, বিশেষে, ই উ বা য-ফলা পরে থাকলে এই 'অ' উচ্চারণে 'ও'-এর মত হয়ে দাঁড়ায়। শব্দান্তেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অ 'ও'-এর দিকে টান রাখে। অথচ অভাব-বোধক আদি 'অ' কোনো কারণেই ও-এর মূর্তি নেয় না। এক্ষেত্রে প্রবলতর অর্থ-সংস্কার উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে। তিনি আরও অনুভব করলেন যে বাঙলা উচ্চারণে ই এবং উ এই দুটি স্বরের প্রতাপ এত বেশী যে পরবর্তী অ, আ-কে বদলে দিতে সক্ষম। অন্য একটি নিবন্ধে তিনি দেখালেন যে বাঙলা বানানের আদ্যক্ষরে 'এ' থাকলে তার উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রেই 'এ্যা' হয়ে পড়ে। যেমন, এ্যাক্ এ্যাখন। আধা-ও এর মতো এই এ্যা-ও বাঙলায় ব্যবহৃত নোতুন স্বর। এমনতর ব্যাপার কী

করে হচ্ছে পরবর্তী সময়ে আচার্য সুনীতিকুমার তার সমাধান ক'রে দিয়েছেন। 'শব্দতত্ত্ব' পুস্তকের এক অধ্যায়ে বাঙলা বহুবচন নিয়ে আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এতে রবীন্দ্রনাথ পূবী হিন্দী, পশ্চিমা হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির সঙ্গে বাঙলা 'সম্বন্ধে'র ভিত্তির তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে সম্বন্ধপদের 'র' বিভক্তির সঙ্গে বহুবচনের 'রা'-এর যোগ রয়েছে। এ ছাড়া বাঙলায় বহুবচনে রা-যুক্ত 'সব' ও রা-হীন 'সব' শব্দের ব্যবহার ও তার বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করেছেন। কবি-প্রদর্শিত তুলনামূলক বিষয়টি অবশ্য পরিশুদ্ধ আকারে সুনীতিকুমারের আলোচনায় একটি সামগ্রিক রূপ নিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রথমে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামে 'রা' আশ্রয় পেয়েছে, পরে মানুষ থেকে ইতর প্রাণী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু তরুলতা পর্যন্ত এগোয় নি। আর সম্বন্ধ থেকে ক্রমে বহুবচনে যাওয়ার মূলে এর দুর্বলতা থাকায় এর সঙ্গে বহুত্বজ্ঞাপক 'সব' শব্দের যোগও প্রথমের দিকে প্রয়োজনীয় হয়েছে। বাঙলার সম্বন্ধ কারকে এর, র বিভক্তি ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'কার' শব্দাংশের প্রয়োগ লক্ষ্য ক'রেও রবীন্দ্রনাথ একটি নিবন্ধ লিখেছেন। সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি পড়েছে ভাষা হিসাবে সংস্কৃত থেকে বাঙলার মৌলিকতার উপর।

বাঙলা ১২৯৯ সালে 'সাধনা' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় মনীষী কবি বাঙলায় শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ ও ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ বিষয়ে প্রথম ব্যাপক আলোচনা করেন। স্বকীয় অনুসন্ধান, তালিকা প্রণয়ন ও সামান্য ইতরবিশেষের কারণে একই রকমের শব্দের ভাবগত পার্থক্যের বিষয়ে তিনিই প্রথম আমাদের চক্ষুরন্মীলন ঘটান। ঐ সব শব্দের প্রয়োগে ইঙ্গিতময়তার ব্যাপারটি তাঁকে বিস্ময়ের সঙ্গে আকর্ষণ করেছে দেখতে পাই। এইসব দ্বৈতের শব্দাবলীকে তিনি বিভিন্ন কোঠায় ভাগ ক'রে সেগুলির বাচকতার ভিন্ন ভিন্ন দিক ধরিয়ে দিয়েছেন, যেমন- বারে বারে, পরে পরে, কথায় কথায় প্রভৃতির পুনরাবৃত্তিবাচকতা ; মুখে মুখে, চোখে চোখে প্রভৃতির পারস্পরিকতা ; মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে প্রভৃতির নিয়ত-সংলগ্নতা ; লম্বা লম্বা, নূতন নূতন প্রভৃতি বিশেষণের ক্ষেত্রে ভাগ-ভাগ-করা বহুলতা ; জ্বর জ্বর, শীত শীত, মেঘ মেঘ, যাব যাব প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বল্পতা, মৃদুতা, দ্বিধা প্রভৃতি ; আবার কেঁদেকেটে, চেচিয়ে-মেচিয়ে, বকেঝকে, চাষাভুসো, খাবার-দাবার, ছুতো-নাতা ইত্যাদির দ্বিতীয়াংশের নিরর্থকতার সঙ্গে প্রথমটির মিলনে অর্থবহতা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এতসব বৈচিত্রের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ্য অবদান হ'ল বাঙলার ধ্বন্যাত্বক বা অনুকার শব্দগুলির দিকে আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ। ছন্দে ভাষায় কাব্যিক ইশারা-ইঙ্গিত নির্মাণের শ্রেষ্ঠ কবি মাতৃভাষার এই বিশেষ ক্ষেত্রটি সহজেই আবিষ্কার করেছেন এবং আমাদেরও চিনিয়ে দিয়েছেন। এই ধরণের ধ্বনি-শব্দের পরিস্ফুট অর্থ ব্যক্ত করা যায় না, অথচ এগুলির অন্তর্নিহিত ইশারা-শক্তির বলে অন্তরে সবটাই পরিষ্কার বোধগম্য হয়, যেমন-করকর, কনকন, কিচকিচ, কিচমিচ, কুলকুল, কলকল, খচখচ, খিটমিট, খিটখিট, চকচক, চকমক, উসখুস, ঝিকঝিক, ঝিকমিক, ছটফট,

টুপটাপ, চোঁচোঁ, ঠংঠাং, ধূ ধূ, ঝাঁ ঝাঁ, খাঁ খাঁ ইত্যাদি শতাধিক। আবার মাঝখানে স্বরের পরিবর্তন ক'রে চুপচাপ, ফিসফাস, ফিটফাট প্রভৃতিও। 'ভাষার ইঙ্গিত' নিবন্ধে এই শ্রেণীর শব্দগুলির উচ্চারণ ও রূপের বৈচিত্র্য ধ'রে তিনি মূল দুটি বিভাগ পেয়েছেন। চকচক,কনকন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেগুলির মাঝখানে কোনো ধ্বনিপরিবর্তন নেই, সেগুলিকে বলতে চেয়েছেন 'ধ্বনিদ্বৈত' আর ফিটফাট, চুপচাপ, ধুপধাপ, উসখুস, চকমক প্রভৃতিতে মাঝখানে ধ্বনির পরিবর্তন ক'রে নেওয়া হয়েছে ধ'রে সেগুলির নাম দিয়েছেন 'ধ্বনিদ্বৈধ' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "এই যতপ্রকার জোড়া শব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে-অর্থ, তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা। "অর্থাৎ এ শব্দগুলিকে ভেঙে সমাস ও ব্যাসবাক্যের অধীন কোনো-মতেই করা যায় না।প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যেমন দেখা যায়-বন ও জঙ্গল, ঝোপ ও ঝাড়, কেঁদে ও কেটে, সেজে ও গুজে, চেয়ে ও চিন্তে, জিনিস ও পত্র, লোহা ও লক্কড় প্রভৃতি, তা অবিবেচনা-প্রসূত। এগুলি গোটাগুটিভাবে উৎপন্ন শব্দ এবং ভাঙতে গেলে বহুক্ষেত্রেই বিপাকের সম্মুখীন হতে হবে।

এখানে আমাদের একটা বক্তব্য পেশ করছি। রবীন্দ্রনাথ, এমনকি পরবর্তী সুনীতিকুমারের সামনেও তখন সাঁওতালী ও মুণ্ডারী অভিধান ব্যাকরণ ছিল না, তাই তাঁরা ঐ রকম ধ্বনিমূলক বা অন্যবিধ শব্দদ্বৈতগুলির সূত্র ধরিয়ে দিয়ে যাননি। পরে দেখা গেছে সাঁওতালী ও মুণ্ডারী অভিধানে এসব দ্বৈত ও দ্বৈধের সামান্য এদিক ওদিক নিয়ে বাঙলায় প্রায় সবই মিলে যাচ্ছে,আর সেখানে দ্বৈতরূপে প্রতিভাত শব্দগুলি একই শব্দ, দুয়ের মিশ্রণ নয়। তবে কোলমুণ্ডা ভাষার আদিমুলে এগুলি পুনরাবৃত্তিমুলক দুই শব্দ ছিল কিনা তা এখন কোনোমতে বলার কিছু উপায় নেই। বাঙলায় আমরা অনুকার-দ্বৈতের যে শব্দগুলি ব্যবহার করি তা ছাড়া হাজার ঐ ধরণের শব্দ আদিবাসীদের ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। আমরা স্বল্প কিছু গ্রহণ করেছি, কিছু কিছু ঐ আদর্শে সৃষ্টি করে নিয়েছি। আবার অনেক নিও নি। কোনো কোনো শব্দ আগে পিছু বদলে নিয়ে আমাদের উচ্চারণ সহজ করে নিয়েছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থেও পরিবর্তন এনেছি এমন দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, আমরা বলি ফিসফাস বা ফুসফাস, অর্থাৎ নিচুস্বরে উষ্ম উচ্চারণে কথা বলা, সাঁওতালীতে 'ফুসফুস'। অর্থ একই। তেমনি আমরা ব্যবহার করি চুপচাপ, সাঁওতালী মূলে রয়েছে চাপচুপ, যার ইঙ্গিত হ'ল কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা। 'টলটল' শব্দটি বাঙলায় জানাচ্ছে তারলা এবং পরিচ্ছন্নতা, কিন্তু সাঁওতালীতে এর দ্যোতনা হল 'অনেকটা বিস্তারযুক্ত'। ঠনঠন শব্দে মুণ্ডারীতে বুঝায় শুষ্কতা, যা থেকে 'ঠনঠনিয়া', কিন্তু আমাদের কাছে তা শুন্য কলসীর আওয়াজ দ্যোতনায় নিযুক্ত হয়েছে। তেমনি 'চড়চড়' শব্দের মূল অর্থে বোঝায় তীব্রতা রুক্ষতা, আমাদের কাছে 'শক্ত জিনিসের ফেটে যাওয়া'। 'ছমছম' এর সঙ্গে 'ঝমঝম'-এর সম্পর্ক; 'ছমছম'-এর মৌল দ্যোতনা মুর্চ্ছার মত অবস্থা (ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে যা হয়)। আমরা কেবল ভয় পাওয়ার মানসিক

অনুভব ব্যক্ত করছি। এ রকম পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তবু এসব অনুকার-শব্দের মূল ভাণ্ডার যে আদিবাসীদের মধ্যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে দ্বিত্বের মত প্রতিভাত শব্দগুলির ক্ষেত্রেই নয়, এককরূপে ব্যবহৃত, মূলে অনার্য ও অর্থবান্ এবং আমাদের কাছে অনুকারবৎ প্রতীয়মান শব্দগুলিতেও ঐভাবে ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যেমন-কোঁচ্কা, ফচ্কে, চ্যাংড়া, চট্কা, ছল্কা, চপ্সা, ফুট্কি, মুটকী, ধুমসী প্রভৃতি। এগুলির ধাতু-প্রত্যয় নির্ণয় অসম্ভব। আবার দেখা যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বীকৃত পারস্পরিক ক্রিয়াবাচক ও দুইপক্ষ-নির্দেশক কানাকানি, হাতাহাতি, চুলোচুলি প্রভৃতি শব্দের কোনো-কোনোটি বাঙলায় কেবল একপক্ষ দ্যোতক হয়ে পড়েছে, যেমন-ছুটোছুটি করে তো গেলে, তারপর? টানাটানির সময়। কাছাকাছি কোথাও আছে নিশ্চয়ই। নাচানাচি ক'রে কী হবে? লেখালেখি ক'রেও কিছু হ'ল না। এবার কবির শব্দতত্ত্ব-সংলগ্ন আলোচনা সম্পর্কে দু'-একটা কথার উত্থাপন ক'রে কবির 'বাঙলাভাষা-পরিচয়' পুস্তিকায় আসছি।

একটা কথা হ'ল শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়ে দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কৃত-বাংলার মত দেখায় এমন 'পত্র' শব্দের ব্যবহার, যেমন- জিনিসপত্র, মালপত্র, গহনাপত্র, আসবারপত্র প্রভৃতি। প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণগুলিতে দেখি সংস্কৃত 'পত্র' শব্দের অর্থসংগতি এসব জায়গায় হচ্ছে কিনা তা না ভেবেই জিনিস ও পত্র, মাল ও পত্র, গহনা ও পত্র এরকমভাবে দ্বন্দ্বসমাসের বিধান দিয়ে লেখক ও শিক্ষকেরা নিশ্চিন্ত থাকেন। এখন আমরা দেখছি যে উক্ত জোড়শব্দগুলি মূল ধ'রে অবিভাজ্যরূপে আমাদের কাছে এসেছে; এবং দ্বন্দ্বসমাসের ক্ষেত্রে যদি ফেলাও যায়, ব্যাসবাক্য রাখতে হবে গহনা ও গহনার মত আনুষঙ্গিক বস্তু, মাল ও মাল সংলগ্ন শাখা-বস্তু ইত্যাদি। কারণ, সংস্কৃতের মূর্তি পরিগ্রহ করা ঐ 'পত্র' শব্দটির আসল রূপ হ'ল সাঁওতালী 'পত্রঃক্' যার অর্থ প্রশাখা, ফেঁকড়ি। গহনাপাটি শব্দেও ঐ একই অর্থ এবং পাটি অংশের 'প' লেখা বা ছাপার ভুলে 'গ' হয়ে দাঁড়িয়েছে 'গহনাগাটি'। কেনাকাটা, কান্নাকাটি, কেঁদেকেটে প্রভৃতি শব্দের দ্বন্দ্বের আভাস ঠিকই। কিন্তু ওখানে 'কাটা' ক্রিয়ার অর্থ বেঁচেবর্তে থাকা বা কাল কাটানো অর্থাৎ যাপন করা। এসব শব্দ এমনভাবে গঠিত যে ভেঙে ফেলে অর্থ বোঝানো যায় না।

আজকালকার ব্যাকরণগুলিতে প্রচলিত নামের কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলিকে তিনভাগে বিভক্ত ক'রে দেখানোর রেওয়াজ দেখা যায়, যেমন –সংস্কৃত, খাঁটি বাঙলা, বিদেশী। কতকগুলি প্রত্যয় যে সংস্কৃতের নয়, খাঁটি বাঙলার, তা রবীন্দ্রনাথই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এই প্রত্যয়গুলির কোনটিতে বিশেষণ, কোনোটিতে ভাব-বিশেষ্য, কোনোটিতে বা ক্রিয়া-বিশেষ্য এইসব দ্যোতিত হয়ে থাকে। কোথায় সংস্কৃতের ণ্যৎ-যৎ-ক্যপ্, ঠক্-ঠঞ্-বুঞ্ আর কোথায় বাঙলার অ, আ, অনা, ই, উ, টা, টে, পনা, তর, নি, নী প্রভৃতি! লৌকিক বাঙলার শব্দগুলি এই শক্তিতেই চলে, গ্রাম-বাঙলায় এই সব প্রত্যয়জাত শব্দ নিয়েই মানুষের লোকব্যাহার আজও

সচল। পাঠ্য এবং অধ্যবসায় সহ শিক্ষণীয় কেতাবী ভাষার প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ জীবনে তা না হলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত খাঁটি বাঙলা প্রত্যয়ের পরিচিতি সহ তালিকাটি পরবর্তী ব্যাকরণকারদের কাজে লেগেছে। ওগুলি মধ্যে আ, আমি, আমো, টা, টে তর, (তরহ্) নিঃসন্দেহে অনার্যমূল।

মাতৃভাষাচর্চা বিষয়ে রবীন্দ্রের দ্বিতীয় আলোচনা-পুস্তক 'বাঙলা ভাষা পরিচয়'।এই পুস্তিকাটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তার প্রৌঢ় পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেখতে গেলে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমারের বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধীয় প্রখ্যাত গ্রন্থ ও অন্য বহু আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার পরও বাঙলার প্রকাশভঙ্গির স্বকীয় বহু দিক কেবল বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের দ্রষ্টা কবি অনুভব করেছিলেন। প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ নয়, তাত্ত্বিকতা তো নয়ই, আগ্রহশীল পথিকের চোখে আকর্ষণযোগ্য যা যা ঠেকেছে তা সাধারণেও দেখুক ও বাঙলাভাষার লুকানো শক্তি উপলব্ধি করুক এই আন্তরিক প্রেরণাবশেই তিনি উক্ত পুস্তকের বাইশ-তেইশটি অধ্যায়ের বিন্যাস করেছেন। দেখা যায়, এসবের মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম নিবদ্ধ করার দিকে কবির কোন আগ্রহ নেই, শুধু রূপদশীর প্রেরণাবশে যেসব সাম্য ও বৈচিত্র্য আপনা থেকে চোখে পড়েছে তা দেখিয়ে দিয়েই যেন তিনি পরিতৃপ্তি বোধ করেছেন। গ্রন্থটির প্রাথমিক কয়েকটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ভাষার দর্শন অর্থাৎ ফিলজফি উপস্থাপিত করেছেন। ভাষা কেন, ভাষা কিভাবে গড়ে ওঠে, ভাষা প্রতীকের কাজ ক'রে কিভাবে মানুষের অনিদিষ্ট ভাবনাকে বাঁধে, ভাষার ইঙ্গিত-ইশারা দেওয়ার শক্তি, ভাষার সাহিত্যিক মূর্তি, সামাজিক ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি নিয়ে বিচার-বিবেচনা ক'রে এবং চলিত বাঙলার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বিষয় বুঝিয়ে, চলিত বাঙলায় মৌল স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে বাঙলা শব্দের গঠনে ও ব্যবহারে ইঙ্গিত ও ভঙ্গিমার প্রধান্য নির্দেশ করেছেন। কয়েকটি অধ্যায়ে সাধারণ বাঙলা প্রত্যয়, স্ত্রী-প্রত্যয়, বহুবচন, সম্মানবাচী শব্দ ও সর্বনামের প্রয়োগ-বৈচিত্রের মধ্যে এসেছেন এবং কারক-বিভক্তি প্রয়োগে সংস্কৃত থেকে বাঙলার পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে বহু বিচিত্র ক্রিয়ারূপের শক্তির বিচার করেছেন।তারপর শব্দে ও বাক্যে সংলগ্ন অব্যয়গুলি ভাষার প্রকাশ-শক্তি কতদূর বাড়িয়ে তুলেছে তা উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। সর্বত্র লক্ষ্য রেখেছেন বাঙলার খেয়ালী স্বকীয়তার দিকে এবং সর্বত্রই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সংস্কৃতের ক্ষেত্রে বিভক্তি-প্রত্যয় লিঙ্গ-বচন প্রভৃতিতে যেমন পাকা নিয়ম আছে বাঙলায় তা নেই। কোনো নিয়ম বাঁধতে গেলেই ব্যতিক্রম এসে পথ রোধ করে দাঁড়াবে। নিয়মের যুক্তি এবং অনিয়মের যুক্তিকে যিনি এককোঠায় বাঁধতে পারবেন তিনিই হবেন এই চলন্ত ভাষার প্রকৃত বৈয়াকরণ। দেখতে গেলে বাঙলায় পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে বড়রকমের বিভেদ কিছু নেই। সর্বনামে তো নেইই, বিশেষণেও নেই, যেটুকু হয়ে থাকে তা সংস্কৃতের অনুকরণে। স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃতের 'আ' বাঙলায় চলে না, ঈ চলে, কিন্তু নী-ইনীর দিকে থাকে প্রবল ঝোঁক। বহুবচনেও তেমনি, নবসৃষ্ট-রা

অথবা গুলি-গুলা। তাছাড়া আছে 'সব-সকলে'র যোগ বা বিশেষণের বিশেষ্যের দ্বিত্ব। কারকের ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে কর্তায় বিভক্তি না থাকাই নিয়ম, ক্রিয়ার আধিপত্যে কারক দুর্বল হয়ে পড়ে ব'লে কর্তায় যদিবা একটা 'এ' লাগানো যায়, সবক্ষেত্রে পারা যায়না।একথা বলা যায় না যে গোপালে সন্দেশ খায়, কি, রহিমে গাছে চড়ে। যদি বলা যায় যে বিশেষ নামের ক্ষেত্রে 'এ' অচল, তখনই দেখানো যায়, 'রামে মারলেও নারবে রাবণে মারলেও মারবে।'এই কারণে অবশ্য সুনীতিকুমার কর্তার 'এ' টাকে করণের 'এন'-জাত 'এ' ধরেছেন, যেহেতু বহু বাঙলা বাক্যের গঠন মৌলিকভাবে কর্মবাচ্যের। কর্মকারকে আগেকার 'রে' ছেড়ে 'কে' ব্যবহারই নিয়ম, কিন্তু সেখানেও বিভক্তি না দেওয়াই বড় নিয়ম।

সর্বনামের একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আত্মবাচক 'আপন' এবং মধ্যমপুরুষের মানবাচী 'আপনি' শব্দে এসেছেন। অর্থে ও প্রয়োগে অত্যন্ত পৃথক হলেও এই দু'টি শব্দের উদ্‌ভবের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত একই মূল দেখা হয়েছে। সেটা হ'ল সংস্কৃতের 'আত্মন্' অর্থ নিজ, স্ব। হিন্দীতেও অপনা, কিন্তু মানের ক্ষেত্রে 'নি' ছাড়াই 'আপ'। ফলে শব্দ দুটির একই মূল হতে পারে না, আমাদের এই ধারণা। এবং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণও মিলেছে। নিজ অর্থে আপন, আপনা 'আত্মন্' থেকে নিঃসংশয়ে। কিন্তু মানবাচী আপ, আপনির মূল হ'ল কোল-মুণ্ডা মধ্যম পুরুষের বহু বচনের 'আপে' এবং আপে + হুনি। 'হুনি' হ'ল ঐ মধ্যম পুরুষরই জোর-দেওয়া নির্দেশক কোল মুণ্ডা শব্দ। বাঙলা ঐ শব্দটাও 'আপে'র সঙ্গে নিয়েছে, হিন্দী নেয়নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাঙলা-ভাষা-পরিচয়ে আমাদের বাক্যের খায়ালী রীতি-প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তা হ'ল প্রত্যয় ও অব্যয় নামে পরিচিত বেশ কয়েকটি শব্দাণুর বহু বিচিত্র অর্থে প্রয়োগের দিক। বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সেগুলি বিভিন্ন মনোভাব ইঙ্গিতে জানানোর ক্ষমতা রাখে। এগুলি প্রতীকী শক্তি-সম্পন্ন শব্দাণু, যেমন-ই, ও, ক, কী, তো, গো, গে, যে, না। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে এ ধরণের অব্যয়শব্দের প্রতাপ সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গিতে সাধরণভাবে পাওয়া যায় না। প্রয়োগের উদাহরণ দিচ্ছেন- হলই বা, গেলই বা, নাই বা গেলে, না গেলেই বা কী, কী-ই বা এমন রূপ, যাবে তো, কর তো, নয়তো কী, সেও, তুমিও, সে এলে তো, তুমি তো এখন আসই না, তাই তো, কী যে বকছ, সে যে আসবে না তা জানি, মরুক গে, করুক গে, না গ, অমা কী হবে গো, সেকি গো, দাও না গো, যাবনাক ইত্যাদি। এগুলির কোথাও বিকল্প, কোথাও অনুনয়, কোথাও জোর, কোথাও প্রত্যাশা, কোথাও বিস্ময়, প্রভৃতি নানান সূক্ষ্ম ভাব দ্যোতিত হচ্ছে। এরকম নানা কারণে আমাদের মাতৃভাষাকে রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গিপ্রধান ভাষা ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।

ঐ সব বিচিত্র অব্যয়গুলি মূল নির্ণয় করতে একটু বেগ পেতে হয়। কয়েকটি সংস্কৃতে পাওয়া যাচ্ছে, যেমন বা, যে (যদ্) ই (=হি), কি-কী (কিম্), না (ন, নাম), কিন্তু ও, ত-তো, গ-গো, এগুলি অনার্য অর্থাৎ কোলমুণ্ডা থেকে পাওয়া। আমিও, তুমিও, সেও, ইত্যাদির 'ও' মধ্যযুগের

বাঙলায় পাওয়া যাচ্ছে আমিহ, তুমিহো, সেহ রূপে। এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথও লক্ষ্য করেছেন। এই হ-এর অনিবার্য মূল হ'ল সাঁওতালীতে ব্যবহৃত হঁ যার অর্থ তা ছাড়া, তা শুদ্ধ; এবং ত-তো হ'ল সাঁওতালীর প্রায় প্রতি বাক্যে ব্যবহৃত 'দ' যার বাচকতা হচ্ছে একটু কিন্তু, একটু অনুনয়, একটু নিশ্চয়। গ-গো এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ, একটু জোর, নিশ্চয়, প্রতিবাদের ইঙ্গিত। তা ছাড়া আক্ষেপবাচকতাও বটে। এজন্য গানে ও লিরিক কবিতায় কেবল 'গো'-এর দেখা পাওয়া যায়। বাঙলায় খঁটি এবং বাচক 'ও' এবং বিশেষণ-জ্ঞাপক বা সম্বন্ধদ্যোতক ঈ= 'ঈ' 'ই' অবশ্য ফারসী মূল থেকে এবং এর অর্থও সংস্কৃত থেকে পৃথক।

ব্যাকরণ ও তার মূলীভূত ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুদীর্ঘ হলেই ঠিক হয়। কিন্তু পরিসরের স্বল্পতায় আত্মসংবরণ করছি।

বানান-সমস্যা সমাধানের একটা পথ

কোনও কোনও সংবাদপত্র এমন কি শিক্ষক-লেখকদের মুদ্রিত বই খুললেও দেখা যায়-দিল, পেল, করল, দেখল, বলল। চোখে ঝলকানি ও কানে খটকা লাগে।এক্ষেত্রে বিশেষ কারও কারও মৌখিক ব্যবহারকে শিষ্ট চলিতের মধ্যে চালানো হয়েছে। আমরা আগাগোড়া শুনে এসেছি এবং ব্যবহার দেখে এসেছি-দিলে, পেলে, করলে, দেখলে, শুনলে; অথচ –গেল, চলল, হাসল, কাঁদল, ঘুমাল ইত্যাদি। ভাষায় এই ব্যবধান রাখার মধ্যে জনচিত্তে একটা অর্থ নিহিত ছিল। ক্রিয়া সকর্মক হলে অতীতের বেলায় অকর্মক থেকে তার পার্থক্য রাখার প্রয়োজন-বশে রূপে পার্থক্য মানুষ আপনা থেকেই সৃষ্টি করে নিয়েছে। নিয়েছে বোঝার এবং বোঝানোর সুবিধার জন্য। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বাঙলা অতীতের 'ল' এসেছে প্রাচীনের 'ত' এর সূত্র ধরে, আর ভবিষ্যতের 'ব' এসেছে 'তব্য' থেকে, কর্মভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য রূপান্তরিত হয়ে। ঐ সময় যদি বেত্রধারী কেউ থাকতেন তাহলে বলতেন-না, না, ভাষায় এরকম অনাচার চলবে না। কিন্তু বাঙলা, হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক ভাষার সৌভাগ্যক্রমে তখনও কোনও দন্ডধারী গজিয়ে ওঠেন নি। বৈয়াকরণদের মনোযোগ ছিল সংস্কৃত-প্রাকৃতে। ভাষা গুলোকে তাঁরা কৃপা ও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতেন। সাম্প্রতিকেও এমন দেখা গেছে যে সংস্কৃতের পঞ্চতীর্থ পন্ডিত মশায় বাঙলায় কিছু লেখার বেলায় হ্রস্ব-দীর্ঘ ন-কার শ-কার মানছেন না এবং তাতে তাঁদের কোনও আক্ষেপ নেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং তাঁদের সমকালীন লেখকেরা সকর্মক ক্রিয়াপদের অতীত ও ভবিষ্যতের পুরূষগত রূপের পার্থক্য প্রচলিত মৌখিক থেকে নিয়ে সেগুলির সাধুরূপ দিয়েছিলেন-করিলেক, পাইবেক। মৌখিকে ছিল কইরলোক, পাইব্যেক। এই ল, ব o এক প্রথম-পুরুষবাচক। উত্তম-মধ্যম ছিল করিলুঁ, করিলাম, কইরলম্, এবং করিলে। বিদ্যাসাগর মশায় জোর করে ঐ 'ক' আমদানি করেন নি, ভাষায় পার্থক্য সংরক্ষণের নিয়ম অনুসারে লোকমুখেই তা সৃষ্ট হয়েছে। নতুবা একেবারে মূলে যখন কর্মভাববাচ্যের 'তব্য' থেকে-অব্ব, ব হয় তখনকার রূপ ছিল-আম্ভে (আমি) করিব, তোম্ভে

(তুমি) করিব, তেঁ (সে) করিব। সব এক। কর্তৃবাচ্যে আসতেই পুরুষ-বাচক বিভক্তি জোড়া লাগল, একটা থেকে অন্যটা রূপে পৃথক্ হয়ে পড়ল। পার্থক্য রক্ষা করা ভাষার শক্তির চিহ্ন। বহু আগে সংস্কৃতে দ্বিবচন ছিল। সাঁওতালী ভাষায় আজও তা আছে। 'আমরা' বলতে আমরা দু'জন না বহু এ বোঝার উপায় নেই। সাঁওতালী ভাষায় নারীও পুরুষে লিঙ্গভেদে তেমন নেই, যেমন গুরুতর প্রভেদ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে। এর মূলে তাদের জীবনরীতি নিশ্চয়ই। অনেক আগে বাঙ্‌লা বহুবচন-বিভক্তি রা, এরা হীনতার প্রাণীতে যুক্ত হতে পারত না, সেক্ষেত্রে চলত, সব, গুলা, গুলি। ক্রমে সব একাকার হতে চলেছে। কিন্তু পার্থক্য রাখা উচিত-ভাষার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বোধ্যতার জন্যই। লিখনের মধ্যে এই পার্থক্য রাখার কিছুটা দায়িত্ব বানানের। কারণ, ভাষা কেবল মুখে উচ্চারণের জন্যই নয়, লিখনের জন্যও বটে। একদা প্রাকৃত ভাষার শব্দের মধ্যেকার ব্যঞ্জনের উচ্চারণ উঠে গিয়ে স্বরবাহুল্য ঘটলে এমন অবস্থা হয়েছিল যে এক একটি শব্দে দুটি তিনটি পর্যন্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাতে লাগল। এর ফল দাঁড়াল সংস্কৃত বা কোলীয়ভাষা থেকে শব্দের ঋণ গ্রহণ। অর্থবিভ্রাটের জন্যই আজকের বাঙ্‌লায়-কর-করো-কোরো, করে এবং ক'রে, ধরে এবং ধ'রে, পাঠান এবং পাঠানো মত এবং মতো, বুঝা এবং বোঝা, কাল্ এবং কালো প্রভৃতির পার্থক্য রাখা উচিত, যদিও অকারণে যত্রতত্র একটা ক'রে 'ও' লাগানোর জলীয় অভ্যাস ত্যাগ না করলেই নয়। আবার সহজে পার্থক্য বুঝার দিকটি জোর করে আচ্ছন্ন করে দিয়ে ই-ঈ এর মধ্যে কেবল ই-কারই চালাব এমন ভ্রান্তবুদ্ধি সমর্থন করা যায় না। কারণ ঐ একই, ভাষা কেবল উচ্চারণের জন্যই নয়, লিখনে বোধ্যতার জন্যও।

আমাদের আজকের বানান-সমস্যার মূলে যে ব্যাপারটি রয়েছে তা হল সাধু থেকে চলিত রীতিতে ক্রিয়াপদ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে উচ্চারণ ও লিখনের ভিন্নতা। বানানের ক্ষেত্রে সাধু বলতে আমরা সংস্কৃত শব্দ এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ অনুসৃত লিখন-রীতিকে বুঝছি। যদিও একথা ঠিক যে শিষ্ট চলিতে সাধুর মতই সংস্কৃত শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার চলে। আবার সাধুরীতিতেও সংস্কৃত লৌকিক শব্দের ব্যবহার চলিতের মতই চলে, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে বেশীও চলে। বানানে বিশৃঙ্খলার যে কথা আজ উঠছে তা চলিতের মধ্যে মৌখিক এবং ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী চালানোর জন্য। চলিতে সংস্কৃত-জাত অথবা লৌকিক বাঙ্‌লা শব্দের বানানে আমরা অম্পস্বল্প সহজ পথে চলা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ সাধু শব্দের বানানকে সরল করতে পারছিনা এবং পারবও না, কারণ, বাঙ্‌লায় সাধুরীতি আজও অচল হয়ে যায়নি, আর বহু মনীষীর প্রচুর বই রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়। তা ছাড়া সারা ভারতে সংস্কৃত শব্দের বানানরীতি প্রায় এক। এই ঐক্য বিঘ্নিত করা চলেনা। দু'শ বছর ধ'রে চলতে থাকা সাধুরীতির বাঙ্‌লা গদ্যের মধ্যে বানানের একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছিল, লেখকমাত্রেই তা অনুসরণ করতেন, আর বিচ্যুতি তেমন কিছু ছিল না বললেই চলে। চলিতে

লেখার ধারা প্রবর্তিত হতেই দেখা গেল ঐসব সাধু শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ বাদে সাধুজাত এবং লৌকিক অর্থাৎ দেশী-বিদেশী শব্দের বানান লেখকেরা সকলে একরকম লিখছেন না। তখনকার স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা দেখুন, বানানে গরমিল রয়েছে, আবার ডি-এল-রায় আসরে নামতেই ক্রিয়াপদের চোখ ঝলসানো বানান রীতি দেখা গেল। ঐ সময়কার বা স্বল্প পরের অন্যান্য লেখকদের মধ্যেও চলিতের বানানে প্রচুর বিশৃঙ্খলা ছিল। মৌখিক আর শিষ্ট চলিত যে এক নয় এ বোধ প্রথমের দিকে পাকা হয়নি।তা ছাড়া যেসব সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত বাঙলায় লেখনী চালনা করতেন তাঁরাও বাঙলায় বানান বিষয়ে অবহিত হওয়ার তেমন প্রয়োজন বোধ করতেন না। যাই হোক, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রমথ চৌধুরীর চালনায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় এবং পরে ডঃ সুনীতিকুমারের স্বীকরণে 'চলিত' মৌখিক থেকে পৃথক্ হয়ে পড়ল আখ্যা হল শিষ্ট চলিত, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিশেষে ভাগীরথীতীরের শিক্ষিতজনের প্রায় মৌখিক অর্থাৎ মৌখিকের একটু উন্নত সংস্করণের ভাষা। ফলে সাধু-জাত ও লৌকিক শব্দের বানানের বিশৃঙ্খলা স্বল্প সময়ের জন্য কমল। কিন্তু আবার প্রারব্ধ হল কোনও কোনও আধুনিক সাহিত্য-লেখকের যথেচ্ছতা অবলম্বনে।তাঁরা বিষয়বস্তুতে বাঁধন-ছেঁড়া প্রবৃত্তি নিয়ে চলিত শব্দের বানানও খুশীমত বানাতে আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে সাধুঘেঁষা লেখকেরা সংস্কৃতজাত শব্দের বানানে পুনঃ পুন দৃষ্ট সংস্কৃত বানান যেমন আগেও আঁকড়ে ছিলেন, তেমনই রইলেন। এইসব নিয়ে ১৯৩০ খ্রীঃ নাগাদ বেশ কিছু সংখ্যার একই শব্দের বানানে দ্বিত্ব ত্রিত্ব দেখা যেতে লাগল। যেমন, লিখে-লেখে, শুনে-শোনে, পিছন-পেছন, ভিতর-ভেতর, অভ্যাস-অভ্যেস ওব্‌ভেস, উঠে ওঠে, মত-মতো, ভাল-ভালো, পূজা-পূজো, সোণা-সোনা, কাণ-কান, বঙ্গ-বংগ, শঙ্কা-শংকা, গেল-গেলো, হল-হলো- হোল, করব-করবো-কোরব, পাখী-পাখি, বাড়ী-বাড়ি, কায-কাজ, যুঁই-জুঁই, পোষাক-পোশাক, জিনিষ-জিনিস, আশী-আশি, শীষ-শীস, কুমীর-কুমির, মাসী-মাসি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব বিকল্প এ কল্পের তাড়ায় রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখলেন, রাজশেখর বসু-সুনীতিকুমার প্রমুখদের নিয়ে বানান সংস্কার সমিতি গঠিত হল এবং ১৯৩৫-৩৭ মধ্যে তাঁদের সংস্কার-পুস্তিকা প্রচারিত হল-চলিত শব্দের বানানে পুরানো রীতিকে আংশিকভাবে মান্য ক'রে, আংশিক ভাবে নোতুন বানানের বিধান সহ প্রচুর বিকল্প রেখে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তাঁরা যেমন পুরানো রীতির বানানকে স্বীকৃতি দিয়ে অতি শৈথিল্য থেকে শব্দগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন, তেমনি জীবন্ত চলমান ভাষার অগ্রগামীতাও রোধ করতে চাইলেন না। ঐ বিধান বেশ কয়েক বৎসর শিক্ষিতদের মোটামুটি চালিয়েছিল, অন্ততঃ ১৯৫০-৫৫ পর্যন্ত তেমন বিশৃঙ্খলা অনুভূত হয় নি। অধ্যাপক-শিক্ষকেরা মেনে নিয়েছিলেন, সংবাদপত্রীরা মেনে চলেছিলেন, আর অতি-আধুনিক লেখকেরা বিচ্যুতি-স্বভাবের উঁকিঝুঁকি দেখিয়েও সংস্কার ব্যবস্থাটাকে একেবারে অসম্মান করতে পারেন নি। এরই মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণাগতেরা আসেন এবং বানানে

এখানকার সহজিয়াদের সঙ্গে তাঁদের মিলন ঘটার ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে পুনরায় ত্রিকল্প পঞ্চকল্প পর্যন্ত গড়ে উঠতে থাকে, বিশেষ অতীত-ভবিষ্যতের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে।অবশ্য চলমান ভাষায় এরকম বাঁধন-ছেঁড়া স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যে খুবই উৎকণ্ঠার বিষয় হয় এমন নয়, কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে অনর্থকতা এবং আত্মতুষ্ট যথেচ্ছাচার থাকলে এবং সেই সঙ্গে দিকে দিকে তা প্রবল হয়ে উঠলে সংযমন আবশ্যক হয়ে পড়ে। কালে কালে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার বৈয়াকরণেরা লেখার ভাষায় এরকম বিশৃঙ্খলা রোধের চেষ্টাও ক'রে এসেছেন। যে-সব সভ্যজাতের নিয়ম-মানা ধাত তাঁরা সহজেই একটা সমাধানের মধ্যে এসেছেন। তবে খুব সম্প্রতি আমাদের অধ্যাপক-শ্রেণীর দু-চারজন অতিমাত্রায় শঙ্কিত হয়ে আর এক-দফা সংস্কারের চেষ্টায় নেমে পড়েছিলেন, কিন্তু কোথায় কোথায় ক্ষত হয়েছে সে ক্ষেত্রগুলির চিকিৎসায় না গিয়ে কয়েকটি ভিন্ন ও নূতন বিষয়ে বৈপ্লবিক বিধান দিলেন। ভেবে দেখলেন না যে এটা যদি সত্যই গৃহীত হয় তা'হলেও বিশৃঙ্খলা সীমাহীন হয়ে উঠবে। আর তখন পিছনে ফিরে যাওয়ার পথ থাকবে না। এই অবকাশে ভাষাতত্ত্বের এক অধ্যাপক তৎসম, অর্ধতৎসম দেশী, বিদেশী, ফরাসী জার্মান প্রভৃতির তত্ত্ব উপস্থাপিত করে এক, দুই, তিন, চার ক্রমে নিয়ম টেনে এবং বিকল্প দেখিয়ে এমন এক পাণ্ডিত্যময় সারস্বত প্রতিমা তৈরি করলেন যে তা আপাততঃ কোনো কাজে এল না। বাঙ্‌লা একাডেমি প্রশস্ত মিটিং-এর আয়োজন করে অতি আলট্রা থেকে অতি রক্ষণশীল পর্যন্ত যাবতীয় মত ছাপিয়ে দিয়ে তার কর্তব্য শেষ করলেন। কেউ কেউ মনে করলেন, বানান নিয়ে এত হৈ-চৈ এর কি যথার্থই প্রয়োজন আছে? পাকা সাহিত্যব্রতীদের লেখা যাঁদের চলিত গদ্য অনুকরণযোগ্য, তাঁদের এবং সেই সঙ্গে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ নিয়ে তো তেমন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। তাহলে হৈ-চৈটা কি অতিকৃত এবং এই সুযোগে কারও কারও স্বমত চালানোর বাসনায় পরিকল্পিত নয়? সে যাই হোক, সংস্কারের ক্ষেত্র যে বেশ কয়েকটি আছে, তাতে আমি সন্দেহ করি না। যদিও এতে শিশুশিক্ষা রসাতলে যাচ্ছে এমন অভিমতও গ্রহণ করতে রাজী নই। খৈ-খই, বৌ-বউ, নৌকা, চৌকা, দৈহিক প্রভৃতির মধ্যে, কোন্ বানানটি নিলে দু'রকম লিখতে হবে না, তা তাদের শিক্ষক-অভিভাবক নিজেরা বুঝে জানিয়ে দিলেই হ'ল। একাক্ষরে অমুক হবে, তিন অক্ষরে তমুক হবে, তৎসম হলে এই হবে, তদ্ভব হলে ঐ হবে-এরকম বিড়ম্বনার মধ্যে ছাত্র তো দূরের কথা, ছাত্রের বাবাও যেতে পারবেন না।কারণ দেখানোর দরকার নেই, সোজাসুজি শুদ্ধ বানানের একটি তালিকা ব্যাকরণের বইয়ের সঙ্গে অথবা অন্যভাবে দিলেই হয়। আর নোতুনতর কিছু দেখানোর মোহে যেসব অধ্যপক বা লেখক অধীন হন, তাঁদের দমন করার জন্য বৈয়াকরণদের হাতে তো আর সি-আর-পি থাকে না।

কিন্তু চোখে লাগার মতো যেক'টি বিশৃঙ্খলা এসে গেছে অবশ্যই তার নিবাকরণ চাই, লেখকেরা তা মানবেন এমনটা প্রত্যাশা ক'রেই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বা অভ্যসমূলক প্রবণতাকে বেশীদূর অতিক্রম করলে কোনো কাজ হবে না এবং কতিপয় লেখকের

না হোক, বানানের দিক থেকে জনসাধারণের মানসিক প্রবণতা এখনও সাধুঘেঁষা, অর্থাৎ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-মধুসূধন- বিভূতিভূষণ প্রভৃতির সংলগ্ন। এই জন্যই সুনীতিকুমার-রাজশেখর সাধু শব্দের ই-ঈ এবং শ-স-ষ বানান সাধুজাত শব্দের রাখার বিধান দিয়েছিলেন, অবশ্য কয়েকটি বিকল্প জুড়ে দিয়ে। যদিও তা না দিলেই পারতেন, আজকের এই বিশৃঙ্খলা পোয়াতে হ'ত না। তারপর স্বরসংগতি এবং অভিশ্রুতি ভাষাবিজ্ঞানে যত মূল্যবান্ বস্তুই হোক এবং ক'লকাত্তিয়া মৌখিক বাঙলার চালক হোক না কেন, বানানে সব ক্ষেত্রে তা দেখানো অধিকাংশের অভ্যাসজনিত প্রত্যাশার বিরোধী। পূজো, কুয়ো, পেছন, ভেতর, ও ওব্‌ভেস, হিসেব, বিলিতি এগুলো কলকাতার বাইরে তো ধাতস্থ হয়নি বললেই চলে। তারপর ঐ ঙ এবং অনুস্বারের স্থান নির্দেশ। কোথায় সন্ধি হচ্ছে বা হচ্ছেনা তা বয়স্কেরা কবে ভুলে গেছেন, আর সম্ উপসর্গের ক্ষেত্রে এখানে ঙ চলতেও পারে, কি ওখানে অনুস্বার দিতেই হবে এসব নিয়মের নিরীখ সাধারণের কাছে অবোধ্য হয়েছে এবং তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে অনুস্বার লাগিয়েই সর্বত্র অংগভংগি করা চলবে। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব এবং বিদেশী শব্দের নজীর টেনে বলা হ'ল এ ক্ষেত্রে এই শ হবে, ঐ স হবেনা, কিন্তু কোন্‌টি তদ্ভব, কোনটি বিদেশী এবং কাকে বলে অর্ধতৎসম এসব বোঝাতে গেলে সাহিত্যিক ও সাধারণের জন্য নোতুন করে ইস্কুল খুলতে হবে। বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ কী এবং বাঙলায় কেনই বা তার যথাযথতা রক্ষণীয় এ শিক্ষিতদের মাথায়ও ঢুকতে চাইলে না। এই সেদিন মাধ্যমিকের পাঠক্রম থেকে বিদেশী শব্দের অনুলিখনের অধ্যায়টি আমাদের তুলে দিতে হয়েছে। ধানের শীষ আর হুইসিলের শিসেরই বা পার্থক্য ক'জন রাখবে? শহর, পোশাক, আর শরবৎ, খ্রীস্ট প্রভৃতি নিয়ে বুড়োরাও হিমসিম খেতে লাগলেন।এই সেদিন বাঙলা একাডেমির তরফে বানান বিষয়ে মতান্তর মালা প্রকাশের পর পথে এক শিক্ষক আমাকে প্রশ্ন করলেন- শুনছি ক্ষ এবং ষ আপনারা বানান থেকে তুলে দিয়েছেন। তাহলে ক্ষয়, ক্ষতি ক্ষেত্র আমাদের খ দিয়েই লিখতে হবে, তাই না? এই গেল একদিক অন্য দিকে অতীতের ল-যুক্ত কয়েকটি ক্রিয়াপদে, এমনকি ভবিষ্যতের 'ব' এর ক্ষেত্রও শব্দে 'ও' কারের শ্রাদ্ধ। ক্রিয়ার শেষে 'ল' দেখলে আর রক্ষা নাই, ভাদ্র-বৌরা ঘোমটা টানবেনই। এ কথা বুঝবেন না যে শব্দন্তের ও-কার প্রবণতা আছে মাত্র, পূর্ণ "ও" উচ্চারণে নেই। ঐপ্রবণতার একটা দিক বিবেচনা ক'রে বলা যায় যে হোল এবং কোরব বরং শুদ্ধ বানান; হলো, গেলো, দিলো, ছিলো প্রভৃতি কখনই নয়। এই কারণে ১৯৩৭ এর কমিটি শব্দ শেষে ও-লেখার অনর্থকতা দেখেছিলেন। তবু একথা মনে করা বোধহয় অসংগত হবে না যে উক্ত বানান-সমিতি প্রায় প্রতি পদক্ষেপে বিকল্প রেখেছিলেন বলে সেই রন্ধ্রেই শনি প্রবেশ করেছে। বিকল্প বিহিত করার কারণ, চলমান ভাষাকে কলমের খোঁচার বাঁধন পরানো ঠিক হবে না। যাই হোক, এখন উপায়? বানান-সংস্কার যাঁরা অত্যাবশ্যক মনে করছেন তাঁদের পক্ষে উপায় এই যে, চলিত-চলিত এবং উচ্চারণ – উচ্চারণ করে বেশী বায়ুগ্রস্ত না হয়ে সাধুরীতির বানান-

কাঠামোকে চলিতেও যথাসম্ভব মান্য করার আয়োজন করুন এবং বিকল্পের অবকাশ যথাসাধ্য সীমিত করুন। যেমন উচ্চারণ তেমন বানান হবে এই-ভূতটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলুন। দু চার'টা ক্ষেত্রে কোনও কোনও লেখক মৌখিক ঢুকিয়ে যথেচ্ছাচার করতে চাইলেও তা উপেক্ষা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সরকারী সহযোগিতায় গোলমেলে বানানগুলির একটি শুদ্ধ তালিকা প্রণয়ন করে প্রচার করতে হবে। এইটিই বোধকরি বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বানান-সংস্কারে যে মূল নীতিটি প্রথমেই অনুসরণীয় তা এই যে, যে শব্দের যে-বানান নিতান্ত প্রচলিত হয়ে নাম-করা লেখকদের প্রায় সকলের লেখায় একই মূর্তি নিয়েছে তার পরিবর্তন কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় হবে না। সে বানান অশুদ্ধ হলেও চলবে। দ্বিতীয় পালিতব্য এই যে, বানানের বিধান দিতে গিয়ে বারংবার ভাষা বিজ্ঞানের দোহাই দেব না, কারণ, লেখক সাধারণের কাছে তা অর্থহীন হবে। বিকল্পের অবকাশ কম রাখব। এর জন্য বানান সাধুরীতির সংলগ্ন করতে দ্বিধা করব না। কিছুটা পিছনে ফিরে গিয়েও যদি বিশৃঙ্খলা রোধ করা যায় তা অবশ্যই করতে হবে। চতুর্থতঃ একই শব্দের যদি দুই অর্থ ইঙ্গিত করে তাহলে তার রূপে পার্থক্য রাখতেই হবে। কিন্তু জোর করে বিদেশী শব্দের বিদেশী উচ্চারণের অনুসরণে কোনও বানান বিহিত করব না। বিদেশী শব্দ বাঙলার স্বভাবে যা দাঁড়ায় সেইমতই তা রক্ষা করব। পঞ্চমতঃ বানানের বিষয় ভাবতে গিয়ে অনর্থক মুদ্রণ-টাইপ প্রভৃতি টেনে আনব না। মাথার কমা ও হাইফেন বর্জন তো করবই না, বরং সার্থক ইঙ্গিত দিতে আরও সঙ্কেত উদ্‌ভাবনের বিষয় চিন্তা করব। দু'একটা ক্ষেত্রে বানানের অপব্যবহার দেখলে গেল গেল রব তুলব না। এইভাবে কয়েকটি সাধারণ নীতির উপর দাঁড়িয়ে বানানের যেসব ক্ষেত্রে বিপর্যয় চোখে লাগে তার জড় তু'লে ফেলা যায় কিনা চিন্তা করা যাক।

১)ই – ঈ। উ – ঊ। মূল সাধু বা সংস্কৃত শব্দে যা আছে এবং যা প্রচলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার চলিত রূপেও তাই থকবে। বিকল্প থাকবে না। অর্থাৎ কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, পূব প্রভৃতি লিখব। কুমির,পাখি, বাড়ি, শিস, পুব, লিখব না। পিসী মাসী লিখব। ঝি, দিদি, কচি, মিহি প্রভৃতি বানান সাধুরীতিতেই 'ই'কার দেওয়া আছে। সংস্কৃতের দোহাই দিয়ে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বানানের বিপর্যয় ঘটাতে প্রয়াস করব না।

স্ত্রীলিঙ্গে এবং বিশেষণ-বোধক শব্দের সর্বত্র ঈ রাখব। তবে এক্ষেত্রে সাধুরীতিতে যদি ই-কার চলে গিয়ে থাকে তা বদলাব না। যা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠত অর্থাৎ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের সাধুরীতিতে যা দেখা গেছে তা মান্য করব। এই হিসাবে ইংরেজী, বিলাতী, হিন্দী, দাগী, আসামী, দেওয়ানী, পূজারী সব ঈ-কারান্ত হবে। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ, নী, ইনী সর্বত্র বজায় রাখতে হবে। নাত্‌নী লেখার বেলায় নাতিনীর ঈ-টা কেড়ে নেবে না। সাধুরীতির আদর্শটা বজায় রাখলে ভুলের অবকাশ থাকবে না এমন মনে করা যায়। নতুবা চলিত-মৌখিক রীতি বানানেও জীবন্ত থাকুক আর বিশৃঙ্খলাও চলে যাক, এ দুই একত্র কাম্য হতে পারে না।

(২) সাধুরীতির একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবশ্য মান্য করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়েছে। সেটি হল গুণী, মন্ত্রী, রথী, মনস্বী, প্রভৃতি সংস্কৃতের ইন্ ভাগান্ত শব্দের ক্ষেত্র। এ শব্দগুলি যে মূলে ইন্ ভাগান্ত এবং সমাসে ও প্রত্যয়ের যোগে এগুলি ই-কারান্ত হবে। এ ব্যাপারটি বাঙলার ক্ষেত্রে প্রায় অবোধ্য। আমরা গুণী, মনস্বী প্রভৃতি শব্দগুলিকে ঈ-কারান্ত মূল শব্দ হিসাবে দেখতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে তা পরিবর্তন করা কষ্ট সাধ্য। এগুলির সঙ্গে-দের,-দিগের প্রত্যয় যোগ করতে আমরা ঈ বদলাই না। অতএব ঐ শব্দগুলির গুণীজন, মন্ত্রীগণ, রথীবৃন্দ, তেজস্বীতা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বানানই সর্বত্র চালু হোক।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, মনুষ্যত্ব, দেবত্বের সাদৃশ্যে মহত্ব বানানও নিয়ম হোক, সান্তনা, উচ্ছাস সন্যাসী, উজ্বল প্রভৃতিও চলুক। কেউ নিয়ম চাইলে বলতে পারব বাঙলায় ঐ সব ক্ষেত্রে মহৎ স্থানে মহ, উৎস্থানে উ প্রভৃতি আদেশ হয়েছে।

(৩) সাধুরীতির দৃষ্টান্তকে আদর্শ মেনে নিয়ে হিসাব, পিছন ভিতর, অভ্যাস, ছোট, বড়, কুয়া, পূজা প্রভৃতিই চলুক। ছন্দ রক্ষার্থে রবীন্দ্র-উদ্ভাবিত আমারো, তোমারি, যখনি প্রভৃতি বর্জন করে সাধুতে ফিরে গিয়ে আমারই, তোমারও যখনই কোনও প্রভৃতি বানানেই বরং থাকব। বিশৃঙ্খলা কমাতে গেলে যা ছিল সেখানে প্রত্যাবর্তনের রীতিই সর্বজ্বরহর পন্থা।

(৪)সাধারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদের শেষে অ-স্থানে কখনই ও লাগাব না। ছিলো, হলো, করবো বানান উচ্চারণ অনুসারেও ভুল। পার্থক্য রাখতে আদেশ বা অনুনয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য ও যোগ করতেই হবে। যেমন-কর কিন্তু কোরো (করিও) দেখো, শোনো, চলো তো প্রভৃতি।

(৫) ং এবং ঙ এর বিকল্প পরিহার করে অহঙ্কার, ঝঙ্কার, সঙ্গীত, সঙ্ঘ, রঙ্ বাঙলা প্রভৃতি বানান রাখব। তবে সাধুতেই যেহেতু সংস্কার, সংস্কৃত, সংযম প্রভৃতি বানান স্থির আছে তা বর্জন ক'রে ঙ চালাব না।

(৬) বিদেশী শব্দের বাঙলায় যা স্বাভাবিক লিখন ও উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে তা-ই চলবে। শাজাপন, সাজাহান, সরম, সাদী,পোষাক, প্রভৃতি বদল করে কী সৌভাগ্যলাভ হবে? আর এডয়ার্ড, ও আর্ডসওআর্থ প্রভৃতি লিখে?

(৭)সাধুরীতির বানানের ঐ, ঔ চলিতে চলবে। যখনই যেমনই প্রভৃতি আগের সূত্র অনুয়ায়ী চলিতেও চালু রাখতে হবে। নতুবা আমারি, তোমারো, কখনি, তখনো, তারো প্রভৃতি বেলায় আপত্তি করা চলবে না। একাক্ষর চলিত শব্দের ক্ষেত্রে খৈ, দৈ, বৌ না লিখে কেউ যদি খই, দই, বউ লেখেন তাহলে তার বিনিপাত কামনা করব না। ছোটখাট ব্যাপার কিছু থেকেই যাবে, তা নিয়ে আপত্তি তোলো অন্যায় হবে।

(৮) এক, দেখ, গেল প্রভৃতি বহু বানানে আমরা এ্যা উচ্চারণ করি। 'এ' দিয়ে খাঁটি 'এ' –ও বোঝাচ্ছি আবার 'এ্যা' ও বোঝাচ্ছি। নিঃসন্দেহে এ্যা উচ্চারণের জন্য একটি পৃথক্ স্বরচিহ্ন ও

কার চিহ্ন উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। ‘এ্যা’ পূর্বঞ্চলীয় ভাষাগুলির মজ্জাগত উচ্চারণ। এর উদ্‌ভব কোল-মুন্ডা সূত্রে। যাই হোক, যতদিন নূতন বর্ণ উদ্‌ভাবিত না হচ্ছে ততদিন এ চলুক। তবে আদিতে ‘এ্যা’ ব্যাবহার স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন ‘এ্যা’ স্থানে ‘অ্যা’ লিখন ঠিক। আমরা তা মনে করি না, কারণ, ‘এ’ ও ‘এ্যা’ পূরা সম্মুখধ্বনি, ‘আ’ এর উচ্চারণে জিভ একটু পিছনে থাকে।

(৯) ক্রমশঃ, বশতঃ,ন্যায়তঃ,দৃশ্যতঃ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাধুরীতিতে ফিরে গেলেই আর হাঙ্গামা থাকে না।

(১০) অর্থের পার্থক্য চিহ্নিত করতে মত্‌-মতো, কাল্‌-কালো, কোন-কোনো, কোনও, বাড়ি-বাড়ী এরকম বানানই রাখা ভালো-কী সাধু, কী চলিতে। সেই রকম চলিতে করে-ক’রে, ধরে-ধ’রে, বলে-ব’লে প্রভৃতির পার্থক্য রাখা খুবই প্রয়োজন।

যাঁরা বানানের বিশৃঙ্খলা নিয়ে বেশী বিব্রত বোধ করেছেন তাঁরা এইভাবে একটু পিছনের দিকে যেতে চাইবেন কি না জানি না, নাহ’লে চলিতের সুযোগে যা খুশী তাই রোধ করা সম্ভব হবে এমন মনে করি না। এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি অসংখ্য নিয়ম-পত্তন পন্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে।

কী লিখি, কী বলি

শাস্ত্রবাক্যে বলছে, শতংবদ, মা লিখ। যে কারণেই বলুক, ভাষার ক্ষেত্রে মানুষের কপাল গুণে এরকম মহাবাক্য আর নেই। পৃথিবীর সব ভাষাতেই উচ্চারিত শব্দ-বাক্যে আর লেখার শব্দ-বাক্যে অল্প বিস্তর ফারাক রয়েছেই। এককালে বাঙলায় সাধুর সঙ্গে চলিতের মুখ-দেখাদেখি ছিল না। আলাল এবং হুত্যেম পদীটা খানিক সরিয়ে ফেললেন, বঙ্কিম স্বীকার করেও পাটিশানটা রেখে দিলেন, বিবেকানন্দ সেটা ভেঙেই ফেললেন, কিন্তু পাঁচির আর ভাঙে না। ভাঙল সেদিন যেদিন জামাশই-শ্বশুর দুই মহারথী একযোগে উঠে পড়ে লাগলেন। বাঙলায় এখন আর সাধু চলিতের ভাশুর-ভদ্রবৌ সম্পর্কে নেই, ভাদ্রবৌ-এর ঘোমটা বেশ খানিকটা উঠেছে, দরকারি কথা বার্তাও চলছে, পাড়ার লোকের দলবেঁধে ঝগড়াটাও নেই, তবু কপালের উপরকার ঘোমটা থেকেই গেছে। আর থেকে যে গেছে তার কারণ ঐ সাধু বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। সাধুর ভূত ছাড়াবার ওঝা প্রমথ চৌধুরীর ভাষাই দেখুন না, শতকরা চল্লিশ পঞ্চাশটি সংস্কৃত শব্দ পাবেন। অবশ্য শব্দ ভাষার একটা উপাদান মাত্র, প্রাণ নয়। প্রাণ হ'ল বাক্যের ভঙ্গিমা। তাতে আমরা সংস্কৃত রীতির খবরদারি ঘুচিয়েছি বহুদিন আগেই। কিন্তু গরজ বড় বালাই, সার্বিক ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে ঐ বৃদ্ধের কাছে কাতরকণ্ঠে ভিক্ষা চেয়ে নিতেই হয়। আজকের কেতাবি চলিতের ভঙ্গিমা অনেকটা নিজের মত হলেও শরিকানায় শতকরা পঞ্চাশটি শব্দই তৎসম। অর্থাৎ দুচারটে সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলোকে আগাগোড়া চলিত রেখে এবং ঘরোয়া তদ্‌ভব বা বিদেশী শব্দ একটাকেও আমল না দিয়ে, শতকরা আশিটি তৎসম শব্দের একটি দীর্ঘ বাক্য স্বচ্ছন্দে চলিত স্টাইলের ব'লে চলে যায়। তদ্‌ভব বিদেশী ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার চলিত রীতিতে প্রাধান্য পাবে, তত্বত ব্যাপারটা মেনে নিয়েও কার্যত করা যাচ্ছে না, কারণ, সূক্ষ্ম ও সমুন্নত চিন্তার বাহক খুব কম ঘরোয়া শব্দই ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। এরপর দিন যত যাচ্ছে, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্বের চাহিদা যতই বাড়ছে ততই সেই পুরানো বিরাট হুড়পিটা ঘেঁটে দেখতে হচ্ছে ধাতু শব্দ আর প্রত্যয় কী কী আছে। একদা ইংরেজি-ফরাসিও তাই করতে হয়েছিল, ল্যাটিনের ভাণ্ডারে দাসখত লিখে।

অতএব চলিতের অবগুণ্ঠন পুরোপুরি মুক্ত ক'রে তার স্বকীয় স্বরূপে তাকে পথ-হাঁটানো সম্ভবপর হয়নি, হবেও না।

এই এক কথা। আর এক কথা হ'ল চলিত-মৌখিক দুই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের রেষারেষি। উপভাষার কথা ধরছি না, কলকাত্তা কৃষ্ণনগরিয়া ভাষার কথাই ধরছি। শিষ্ট চলিত তো মৌখিক থেকে আলাদা ঘর পেয়েছে, আলাদা হাঁড়ি করে নিয়েছে প্রায় তার জন্ম থেকেই। হাটে মাঠে যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাও গেছে ঘুচে বছর চল্লিশের ওপর। রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমারের মধ্যস্থতায় মৌখিকের দাবি কিছু কিছু মেনে নিতে হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থাপনায় তবু সব বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও পৃথক্ গৃহস্থালি মোটামুটি ঠিকই চলছে। মাঝে মাঝে বিসদৃশ লাগছে না এমন নয়, তবু তা এমনও নয় যে এখনি আর একটা কলহের পরিস্থিতি এসে পড়ল ব'লে। তা পড়েনি, নেহাত ছোট এবং কদাচিৎ উচ্চারিত শব্দবাণ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পাড়া-পড়শীরা এসব নিয়ে কলহবিলাসের অভিনয় করতে পারেন, কিন্তু দু'শরিকের তুমুল ঝগড়া লাগাতে পারবেন না, যতই চেষ্টা করুন।

কথা এই যে, চলন্ত ভাষা, যার উচ্চারণ লোকমুখে বিভিন্ন কারণে অহরহ পরিবর্তিত হতেই থাকে, তা থেকে লেখার ভাষা পৃথক হতে বাধ্য। চলিত-সাধুর প্রসঙ্গ এখানে তুলছি না। ধরা যাক্ চলিতই বাঙ্লার একমাত্র রীতি। লেখার চলিত অর্থাৎ শিষ্ট চলিত, আর ঐ শিষ্ট অঞ্চলেরই বলার চলিত। বলার চলিত লেখার চলিতকে গ্রাহ্য করে না, খুশীমত বেড়ায়। আর লেখার চলিত লেখক সাহিত্যিকদের অনুসৃত থিতিয়ে যাওয়া একটা আশ্রয়েরই অনুবর্তন করে চলে, কি শব্দে, কি বাক্যে। এরকম হওয়ারও মৌলিক কারণ দুটো। প্রথমত প্রবল জনদরদী হলেও লেখক এ খোঁজ নিয়ে তবে লেখনী ধরেন না যে কোন শব্দের উচ্চারণ তাঁর লেখার সময় কী রূপ নিচ্ছে, আর সে রূপটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে কিনা। এ বিচারে গেলে কোনোকালেই লেখা আর হবে না। দ্বিতীয় কারণ সংস্কৃতি বিষয়ে আমাদের স্বভাবগত রক্ষণশীলতা। মধ্যযুগে দেখা যায়, যুক্ত নাসিক্য ধ্বনিগুলির অনুনাসিক অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে, যেমন, চাঁদ , ভাঁড়, আঁচল প্রভৃতি, কিন্তু তবু কবি অ লেখকরা লিখতে গেলেই পুরানো ধারা বজায় রাখছেন-চান্দ, ভাণ্ড, আঞ্চল। 'য়' এর ব্যবহার খুব পুরানো নয়, এটি দুই স্বর মিলিত শ্রুতির চিহ্ন। উচ্চারণে ঐ মিল দাঁড়িয়ে যাবার পরও কবিরা হরফে লিখছেন- মাথাএ, কান্দাএ। কিছুদিন আগেও চণ্ডীমণ্ডপে যাঁরা রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতেন তাঁরা শব্দান্ত হস্-ব্যঞ্জনটিকে অ-কারান্ত উচ্চারণ করতেন। অথচ শব্দশেষের স্বর উচ্চারণ মৌখিকভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল তিনশ' বছর আগেই। এরকম রক্ষশীলতা সব দেশেই আছে। শব্দের পরবর্তী কোনো স্বরকে আগেই উচ্চারণ ক'রে নেওয়ার একটা প্রবণতা মধ্যযুগে গড়ে উঠেছিল। লিখছি 'সাধু' উচ্চারণ করছি 'সাউধ' লিখছি 'কালি' উচ্চারণ করছি 'কইল'। কবি ও পুঁথি লেখকেরা এই প্রবণতার সঙ্গে উচ্চারণে সামিল হলেও লেখায় সামিল হতে পারেন নি। তাঁরা লিখতেন সাধু, বসু, চারি প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি যে তখনকার

উচ্চারণ নয় এবং সাউধ, বউস, চাইর উচ্চারণ না করলে যে ছন্দ মেলে না তা বেশ ধরা যায়। আবার ঐরকম উচ্চারণ-বিচ্যুত লেখার অভ্যাসের ফলে যেখানে অপিনিহিত উচ্চারণের ক্ষেত্র নয়, ই, উ ন্যায্যত এসেছে, যেমন ঐ চাইর অথবা আউশ, চাউল প্রভৃতির ক্ষেত্রে লেখা হচ্ছে চারি, আশু, চালু, মষি (মহিষ) প্রভৃতি।আজও অনেকে ভুল ক'রে আউশের শুদ্ধরূপ ধরেন আশু(ধান্য)। আরও মজার ব্যাপার আছে-'পাকস্পর্শের নিম্নত্রণ' ।ক'নে বৌকেতো স্পর্শ করিয়েই রেহাই দেওয়া হয় না। ভোক্তাদের পাতে পরিবেশন করানো হয়, তবেই লোকসমক্ষে তার স্বীকৃতি। গোলমালটা ঘটেছে 'পরিবেশ(ন)থেকে উদ্ভূত 'পরশ' শব্দ থেকে। যেহেতু 'স্পর্শ' কবিতায় 'পরশ' হয়ে থাকে, সেজন্য গোলেমেলে এবং আমাদের সাধু-প্রীতিতে ব্যাপারটা ভুল দাঁড়িয়ে গেছে। এরকম বেশী সাধ্বী হওয়ার প্রবণতাবশেই 'সাহায্যে' শব্দটাকে ছেলেরা লেখে 'সাহার্য্য', 'জন্ম' শব্দটা আগে লেখা হত 'জম্ম' ।কিন্তু এ প্রবণতা কি আজও গেছে? আজও যখন দেখি; পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলে ঘোষিত ব্যক্তি দেশীমূল গ্রামনামগুলোকে বেদে পাণিনিতে চালান করছেন কোমর বেঁধে। যেমন বেলেতোড়= বিল্বত্রোটক, পেত্যাকানা= প্রথিতকন্যকা, বেটলাপিঙড়া = বর্ত্মোদ্গলীপিণ্ডক।

রহস্য থাক। আসল ব্যাপার হচ্ছে সাময়িক উচ্চারণের ও কথনরীতির নানান্ বিশৃঙ্খলার মধ্যে না গিয়ে লেখক খোঁজেন একটি গৃহীত রীতি, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রীতি। তাতেই আপাতত ভালো কাজ চলে যায়। তা যদি না হয়, লেখার কাজ অচল হয়ে পড়ে।বানান সহ ব্যাকরণের কোনো সংস্কার করতে গেলে ভালো ক'রে ভেবে দেখতে হয় হট্রগোল এমন প্রচন্ড হয়েছে কিনা যাতে লেখার ভাষা সাধারণের ধরতে বুঝতে আয়াস করতে হচ্ছে। এরকম ব্যাপার উনিশ শতকের বাঙ্লায় কিছু হয়েছিল, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ যার প্রতিবাদ করেছিলেন, যার নীট ফল দেখা গেল ক্রমশ চলিতের প্রবর্তনে। যদিও এতে অভিপ্রেত লৌকিক শব্দের ব্যবহার অনেকে করছেন না, সম্ভবপরও হচ্ছে না নানা কারণে। ঐরকম যথার্থ গুরুতর বিশৃঙ্খলা আর্য ভাষাতেই এক সময় এসেছিল, পাণিনির আগে থেকেই। অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হাল ধরলেন পাণিনি, শক্তহাতে, প্রচুর অভিজ্ঞতা সম্বল ক'রে। ঐ সময় যেমন বেদের ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হয়েছিল, তেমনি লৌকিক ভাষাও বহু বিচিত্র হয়ে উঠেছিল পশ্চিম থেকে পূর্বে, মগধ পর্যন্ত। প্রাকৃত প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল সর্বত্র। প্রথমে তিনি বৈদিক ভাষাকে পৃথক ক'রে তার স্বরূপ নির্দিষ্ট করে ফেললেন। পরে লৌকিককে ঠিক করলেন, যা লোক ভাষায় ভুল-প্রচলিত হয়ে পড়েছে তাকে রক্ষা করলেন। লৌকিক সংস্কৃতের পূর্বী শাখাকেও তিনি অবহেলা করলেন না। নোতুন উদ্ভূত বহু শব্দকেও আশ্রয় দিলেন প্রত্যয় সিদ্ধ করে, প্রচলিত বাগ্ভঙ্গির ভুমান ক'রে। সূত্র সহায়তায় সংস্কৃতে যতদূর পারা যায় স্থিতিস্থাপকতাগুণ আরোপ করে। বহু বিকল্পকেও তিনি আশ্রয় দিলেন স্বচ্ছন্দে। আজ সংস্কৃত প্রাচীন ভাষা, কিন্তু ভেবে দেখতে হবে যে ঐ ভাষার প্রকাশক্ষমতা এতই বেশী যে দু'হাজার বছর ধরে ওতে সাহিত্য দর্শন ও যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের

বই খুব সহজেই নিবদ্ধ হতে পেরেছে। পাণিনি যদি কেবল রক্ষণশীল সংকীর্ণচিত্ত পণ্ডিত হতেন তাহ'লে এমনটি ঘটতে পারত না। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হ'ল ভাষা ব্যবহারে যথার্থই সেরকম বিভ্রাট ঘটছে কি না, যার জন্য সংস্কার ক'রে সঠিক ভাষার পথ দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, নোতুন ব্যাকরণ লিখে।

সম্প্রতি বানান সংস্কার নিয়ে কথা উঠেছিল। বানান ভাষার একটা নগণ্য অঙ্গ মাত্র। আসল বিষয় হল বাক্যের গঠন পদের সঙ্গে পদের যৌক্তিকতাপূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা। উপসর্গ, প্রত্যয়, কারকের বিভক্তি, ক্রিয়ার ভাব কাল বিভক্তির ঠিক ঠিক ব্যবহার, সর্বনাম অব্যয়ের যথাযথ প্রয়োগ, একাধিক বাক্যের উপবাক্যের যোজনা প্রভৃতি। বাক্য অবোধ্য দুর্বোধ্য হলেই সব পণ্ড। ণত্বষত্বে তেমন কিছু যায় আসে না। সংস্কৃতেই তো কত বিকল্পের বিধান। তবু বাঙ্‌লা বানানের হ্রস্বদীর্ঘ ণত্বষত্ব ঠিক করতে চল্লিশ বছরের উপর হ'ল গুণী ভাষাবিদদের কয়েক বছর ধ'রে একাধিক বৈঠক হয়েছিল এবং সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল, যার আশ্রয়ে লেখকেরা লিখছেন, শিক্ষকেরা পড়াচ্ছেন, ছাত্ররাও মোটামুটি জানছে বৈকি। ইতরবিশেষ তখনও কিছু ছিল আজও কিছু আছে এবং চিরকালই থকবে। এই নিয়ে খুব বেশী স্পর্শকাতর হলে বলতে হয় অন্তত প্রতি দশ বছরে একবার করে সংস্কারে বসতে হবে। অনেকে আবার জানতেও চান না, শিখতেও চান না, যা নিজের ভালো লাগে তাই লেখেন। কেউ কেউ গায়ের জোরে যা খুশী চালাতে চান, যেমন খবরের কাগজের সম্পাদকেরা কেউ কেউ। এরকম বিশৃঙ্খল লেখার হাত এড়ানো যাবে না, কমিটি করে কিছু স্থির করার পরও। কারণ, কমিটি হাতে তো আর পুলিশ দেওয়া হবে না। এইসব দেখে শুনে ধর্মভাবুক কোনো সজ্জনকে বলতে শোনা গিয়েছিল-

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ

ভাবে ঠিক সকলেই হ'ল, বানানটা, শব্দ দুটো একটা যা হয় হোক। ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর প্রচারক শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন, পুঁথিগুলি অথবা তাঁদের উপদেশ ভাষণ স্ট্যান্ডার্ড ভাষাতেই নিবদ্ধ থাকছে, কিন্তু শ্রোতাদের সেগুলি বুঝে নিতে হবে নিজ নিজ ভাষায়। চলিত বাঙলারও একটা স্ট্যান্ডার্ড গড়ে উঠেছে, ভাগীরথী তীর অঞ্চলেই আধুনিক লেখক, শিক্ষিত, কৃতবিদ্য মানুষের অবস্থিতির জন্য। যদিও প্রাচীনতর ও সংখ্যাগরিষ্ঠর মৌখিক হিসাবে পশ্চিম রাঢ়ের দাবিই অগ্রগণ্য ছিল, কারণ, আর্যভাষা প্রথম বাঙ্‌লায় প্রবেশ করে ঝাড়খন্ড মানভূবের মধ্য দিয়েই, জৈন ধর্ম প্রচারকদের মারফত। যাক্ সে কথা। এখন যে চলিত বাঙ্‌লা বা শিষ্ট চলিত সর্বত্র চলছে তার মধ্যে, তুচ্ছই হোক আর গুরুতরই হোক, কী কী বিশৃঙ্খলা এসেছে দেখা যেতে পারে। বিশৃঙ্খলাটা মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে দৃষ্ট হওয়া চাই, নতুবা কে কাকে চিঠি লিখতে গিয়ে উল্টোপাল্টা কী করছে, অথবা ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার খাতায় অদ্ভুত যা সব দেখাচ্ছে তা বিচারের বস্তু হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে মনে ক'রে নেওয়া যাক বাঙ্‌লায় চার জাতের শব্দ আছে। এর মধ্যে যেগুলি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, যেগুলির উচ্চারণ আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাছাকাছি একটা ক'রে নিয়ে কাজ চালাচ্ছি, অথচ লেখায় ঠিক রাখছি, তার বানান উচ্চারণ মাফিক রূপান্তরিত করে নিতে পারব কিনা। অর্থাৎ 'সংস্কৃত' শব্দটিকে 'সমস্কৃত' বা 'সঙস্কৃত' 'দুর্বোদ্ধ, 'ঋতু' কে 'রিতু' 'যন্ত্র'কে 'জন্ত্র', 'অঞ্জলি'কে 'অন্‌জলি' 'কণ্ঠ' কে 'কন্‌ঠ' 'ধনী' কে 'ধনি'-এরকম উচ্চারণ মাফিক করতে পারব কি? এ প্রশ্নটি কিন্তু উচ্চারণ এবং বানানের তেমন নয়, যেমন সাংস্কৃতিক, অর্থাৎ কাল্‌চারের এবং সর্বভারত জাতীয় ঐক্যের। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতেই হয় যে না করাই ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে পূর্বপক্ষীয়েরা বলবেন, কেন, আগেই তো সংস্কৃত শব্দের বিকৃত বহু উচ্চারণ শিষ্ট চলিতে চালু হয়ে গেছে, যেমন, অভ্যেস মিথ্যে, কেষ্ট, আস্পর্ধা দুয়ার প্রভৃতি? কথা ঠিক, আবার এও ঠিক যে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ এবং গঠন বহুদিন ধরে বদলাবার ফলেই তো আমরা খাঁটি বাঙ্‌লার গৌরব করছি। কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেচ্য এই যে ঐসব পরিবর্তন লোকমুখে আপনা থেকেই হয়ে এসেছে। ব্যাপক হলে পর সাহিত্যিকেরা তা লিখনে চালিয়েছেন। জোর ক'রে অথবা কমিটি বসিয়ে কেউ তা করতে যান নি। কোমর বেঁধে হঠাৎ কিছু করলে সেদিকে কেউ কান দেবে না, অভ্যাসের বশেই চলবে। ভাষার ক্ষেত্র চোখ অ কানের পুনঃ পুনঃ অনুভবের স্মৃতি একটা বড় কথা। তাছাড়া অন্য ভাষার প্রভাবে পড়েও নিজভাষা বদলায়।কিন্তু যা হয় তা যেন আপনা থেকেই হয়ে যায়। এমনকি পাণিনি যা ঠিক ক'রে দিলেন ফিল্‌ড্‌ ওয়ার্‌ক এর অধ্যাবসায় নিয়ে, তাও তো মুখে চলল না, গ্রন্থবদ্ধ হয়েই রইল। পূর্বপক্ষীয়েরা বলবেন, ভারতীয়তার যুক্তি অচল, কারণ লেখাতেই হিন্দি ওড়িয়া মারাঠী গুজরাটি সংস্কৃত বেশ কিছু শব্দের বহু পরিবর্তন করে নিয়েছে। অনার্যকুলতিলক বাঙালিই বেশী সংস্কৃত-ঘেঁষা। এও ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে হবে যে তার কিছুটা হরফের দৈন্যবশত ঘটেছে, কিছুটা ঘটেছে সরলীকরনের বশে, ঐ আপনা থেকেই । সেও এমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়, যাতে সংস্কৃতের সঙ্গে ঐসব ভাষার অহি-নকুল সম্পর্ক ঘটে গেছে। এ প্রসঙ্গে আর একটা গুরুতর বিবেচ্য বিষয়ও রয়েছে। বাঙ্‌লা সংস্কৃত শব্দের বানান যদি ছাঁতপাত ক'রে দেওয়া হয় তাহলে যারা সংস্কৃত শিখবে, সংস্কৃত গ্রথিত মূল্যবান্‌ বিষয়গুলি জানতে চাইবে তাদের কী বিভ্রাটেই না পড়তে হবে। আর কথা আছে। সংস্কৃতে রেফাক্রান্ত বর্ণের বিকল্প বানান বিহিত আছে, এমনও বহু শব্দ আছে যাতে ই অথবা ঈ, উ অথবা ঊ, শ অথবা স এরকম বিকল্প চলতে পারে। সেক্ষেত্রে সংস্কৃতের কোনো হানি না ঘটিয়েই তো বাঙ্‌লায় সহজ একটা নেওয়া যায় যেমন, রজনি, তরি, অটবি ইত্যাদি। রেফাক্রান্ত বর্ণের সহজ বিকল্পটা তো আমরা অঙ্গীকার করেইছি। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এরকম হলে মন্দ হয় না, কিন্তু সেই বিকল্প রাখতেই হবে, গুরুগিরিতে হবে না, কারণ অবনী, রজনী, অটবী, তরী এরকম ঈ আমাদের এত অভ্যস্ত যে স্বভাবটা সহজে ঘুচবে এমন মনে হয় না। ঐভাবে গুণীজন, ধনীগণ, প্রতিযোগিতা এও চালোনো যেতে পারে।

তবে সংস্কৃত শব্দের বানান নিয়ে বেশি বাড়াবাড়িতে যাওয়া উচিত হবে না। এখনও অনেক নোতুন শব্দ আমাদের চাই এবং তার জন্য সংস্কৃতের দুয়ারেই হাত পাততে হবে।

বিদেশী শব্দের বানান বিষয়ে আমরা একটা নীতি অনুসরণ করেছি, আর তাই নিয়ে বিশেষ মতদ্বৈধ নেই। ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার এবং যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সে নীতি নির্ণয় করে গেছেন। উচ্চারণের ধ্বনি অনুসারে বানান, যেমন শরবৎ, কি নিশান, কি লন্ডন, কি পেটন্ট এইরকম। অবশ্য যে বিদেশী শব্দগুলি বাঙলায় আগে থেকে গৃহীত হয়ে স্বাভাবিক বাঙলার মতই হয়ে পড়েছে সেগুলি ঐভাবেই থাকবে, যেমন, জাঁদরেল, বেকুব, লাট, জোয়ান, আনারস, আলমারি, জানালা (জান্‌লা), টেবিল, ডাক্তার, ইংরেজ প্রভৃতি।

তবু নোতুন-নেওয়া বিদেশী শব্দে ঠিক ঠিক উচ্চারণ কেউ যদি না লেখেন এবং ঐসব ক্ষেত্র ন্ড, ন্ট, শ স্থানে স দিয়ে লেখেনতো তা ভুল বলে ধরা হবে না।বিকল্পের অধিকার দেওয়া আছে। সেই ভালো, তবে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে এটাও আমাদের কাম্য যে শিক্ষিতেরা এ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব ধ্বনির অনুগামীই হবেন। খ্রীস্ট বা খ্রিষ্ট স্থানে 'খৃষ্ট' এবং ব্রিটিশ এর জায়গায় 'বৃটিশ' লেখা ভুল বলেই গণ্য হওয়া উচিত।

বাঙলা বর্ণমালায় কিছু বাড়তি স্বর এমনকি ব্যঞ্জনও রয়েছে, আবার দরকারি অনেক বর্ণ নেইও। গেল, দেখ প্রভৃতি এ্যা (অ্যা) দিয়ে লেখা উচিত, কিন্তু এ দিয়েই চলছে। স্বরবর্ণের তালিকায় এই, আই, প্রভৃতি নিত্যব্যবহৃত দ্বিস্বরগুলি পাওয়া যায় না। আবার উষ্ম ফ,গ,জ প্রভৃতি, পূর্ববঙ্গীয় চ,ছ,ঘ,ধ,ভ প্রভৃতির উচ্চারণ, একেবারে কণ্ঠের, ক,খ, এসব নেই। থাকলে বিদেশী ও দেশী শব্দের উচ্চারণ মাফিক অনেকগুলো বানান রাখা যেত। দেশী অনার্য শব্দ আর্যভাষার গোড়া থেকেই তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং আজও হচ্ছে খুবই অল্প পরিমাণে। সে জন্য এ নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই আমাদের।

এবার তদ্‌ভব বা ঘরোয়া বাঙলা শব্দের পালা। এগুলির লিখনে আগাগোড়া বিশৃঙ্খলা কিছু না কিছু হয়েই এসেছে। এখন আবার নোতুন ক'রে মতদ্বৈধের একটা ক্ষেত্র রচনা করছে। লিখিত চলিতের ক্ষেত্র কিছু শব্দ যথার্থই বহুরূপী হয়েছে। এসবের মধ্যে বাড়াবাড়ি ঘটছে যেখানে-সেখানে অ স্থানে ও-কারের ব্যবহারে। কতকগুলি ক্ষেত্রে আমরা আগেকার আদি অ-কে প্রায় ও রূপে উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি, কতকগুলি ক্ষেত্র তা হইনি। বলা যায় আদ্যক্ষর বা আদিব্যঞ্জনের সঙ্গে 'অ' এর বেলায় প্রায়ই 'ও' হচ্ছে- ওপু, ওশ্রু, ওরুণ, ওতীশ, ওনুনয়, কোবি, কোচু, গোরু, চোরিত্, চোর্যাপদ, চোক্ষু, ধোন্, জোন্, জোন্ত, তোড়িৎ প্রভৃতি। হিসাবে দেখা যায়, উ বা ই (ঊ বা ঈ) পরবর্ণে থাকলে স্বরসংগতির নিয়মেই এরকম হচ্ছে। কলা, বলা, বলে, ধরে, অথৈ, অক্কা, অন্ধ, অষ্টমী, অপূর্ব, অরূপ্ প্রভৃতি স্থানে হচ্ছে না। কিন্তু তাও ঠিক নয়, যে সব শব্দ বহুল ব্যবহার আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে সেগুলির ক্ষেত্রই হচ্ছে বিশেষভাবে, নতুবা –অতিথি, অযুক্ত, অশ্রদ্ধা,

অশ্রুত, অশিষ্ট, অলীক, অশেষ প্রভৃতিতে হচ্ছে না। অথচ অনিল, অশোক, অসিত আতিথ কিন্তু ওযুত্। অন্ধ কিন্তু ওঁদা, সক্রোধ কিন্তু সোত্ত, সোত্তেন। সবিশেষ, সতীর্থ, অমৃত। শোক্র কিন্তু শক্র লক্ষ্মণ কিন্তু লোক্ষণ, ভোক্ষণ ইত্যাদি। যেখানে যেখানে এইভাবে ও-কার প্রবণতা দেখা যায়, সেখানে চলিত লিখনে অনেকে 'ও' লেখার পক্ষপাতী। বিশেষে রবীন্দ্রনাথ থেকে পরবর্তী সাহিত্যিকের দল। এছাড়া শব্দের শেষ অ কার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেই ও এর মত উচ্চারিত হয়; যদিও কলকাতাতেও সর্বত্র হয় কিনা সন্দেহ , আর পূর্ণ 'ও' ঠিক হয়ও না। যেমন, বড়ো, ছোটো, মতো, ভালো, কোরবো, যাবো, নিলো, সাঁকো, শোনো, করো, বারো, তেরো, গেলো প্রভৃতি।রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এখনো, তখনো, কোনো তো বটেই, পারলে- আমারো, তোমারো, আমারি, তাঁহারি এসব গদ্যেও লিখি।অ-স্থানে ও যে কোনো কারণেই হোক না কেন, উচ্চারণের কোমলতা নির্দেশ করে। এরকম প্রবণতার উদ্ভব উনিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতা অঞ্চলের নারীমহল থেকে। হিসাবে দেখা যায় ঐ 'ও' কোথাও পূর্ণঙ্গ হয়েছে, যেমন , হোক্, হোলো, কোর্‌বো, বোলছি, কোরো,নিয়ো, দিয়ো, জানিয়ো, ওতুল, ওনু, বোস্, চোদ্দো ষোলো, প্রভৃতিতে; কোথাও আধাআধি হয়েছে, যেমন এত, যত, এগার, বার, তের, পনের, গেল, নাচ্‌ল, পড়্‌ল,দেব, পাব, যাব, বড়,মত,ভাল প্রভৃতি। এসব জায়গায় আবার যদি আদি অক্ষরটি অ-কারের হয়ে পড়ে, তাহ'লে স্বরসংগতির নিয়মে শেষেটি পূর্ণ 'ও' হয়েই যায়, যেমন, ষোলো, মোলো, দোবো, নোবো। যেভাবে মধ্যযুগের অগ = ওগো হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক'লকাতা-ঘেঁষা জায়গাগুলিতে আদ্যক্ষরে বা শেষ অক্ষরে যে ও-কার প্রবণতা দেখা যায়, যা কোনো কোনো সাহিত্যিকের খুব প্রিয় হয়েছে, তা এখনও খাস কলকাতাতেই পূর্ণতা পায়নি। পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র তো নয়ই। এক্ষেত্রে ভাষা-বিজ্ঞানী হিসাবে যদি কাউকে এবিষয়ে মত দিতে বলা হয় তাহলে তাঁর বলা উচিত হবে যে এসব ক্ষেত্র বিকল্প চলুক যতক্ষণ না ও এর উচ্চারণ পূর্ণাঙ্গ (অথবা পরিত্যক্ত) হয়, এবং প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হয়। বাঙ্‌লা খুবই জীবন্ত চলন্ত ভাষা, এর উচ্চারণ এবং গঠন বদলাতে বদলাতে চলেছে। যে প্রবণতা এখনও সর্বগ্রাস করার দিকে আসেনি, মাঝামাঝি একটা পরিস্থিতিতে রয়েছে তার অবশ্য গ্রহণীয়তা স্বীকার করা যেতে পারে না। সংবাদপাত্রিকেরা জোর করে কিছু চালাতে পারেন, কিছু কিছু কেতাব লিখিয়েও, কিন্তু প্রবণতা পূর্ণাঙ্গ না হ'লে তা সাধারণ্যে গৃহীত হবে না, আর ততদিন বিশৃঙ্খলা কিছু থাকবেই। ধরুন, কলকাতা-হুগলী অঞ্চলের কেউ কেউ বলেন- কী কোরোচো, রেখোছো কি? ধরা যাক এই প্রবণতা বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করলে, আর তাঁদের কেউ কেউ ঐরকম বানান ব্যবহার ক'রে মিনি ম্যাগাজিনে লিখতেও লাগলেন। কিন্তু আপনি এখনই তা গ্রহণ করবেন কি? নিরপেক্ষ ভাষা বৈজ্ঞানিক বলবেন, ঠিক আছে, দেখা যাক এটা প্রায় সার্বজনিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায় কি না। দক্ষিণ বর্ধমান অঞ্চলে খেনু, গেনু, বননু চলে।

এ কিন্তু খুব বিকৃতি নয়, মধ্যযুগের খেলুঁ, গেলুঁ-রই বংশধর, কেবল ল-স্থানে 'ন' টা ছাড়া। কিন্তু ব্যাপক চলিতে এ চলেনি, তার জায়গায় কৃষ্ণনগর-কলকাতার লূম'ই বিহিত হয়েছে। আলালের ঘরের দুলাল বা হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার ভাষা তো শিষ্ট চলিতে গৃহীত হয়নি। কারণ, ওর মধ্যে তখনকার ক'লকাতার কক্‌নিক যথেচ্ছে প্রয়োগ বিকৃতি উচ্চারণ, বিকৃত ক্রিয়ারূপ গঠন। আলোচিত ও-কার-প্রবণতা, যা প্রথমে বিকৃতই ছিল, তা বিকৃতির পর্যায় অতিক্রম ক'রে বহুকে আক্রমণ ক'রে বসেছে। তবে এ বিষয়ে নিঃসংশয়িত বিধানের জন্য আরও ব্যাপক হওয়া পর্যান্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

শিষ্ট চলিতের বানানের অ-সমস্যা ছাড়া আরও কিছু সমস্যা রয়েছে। কী লিখব-অভ্যাস, না অভ্যেস, না ওব্‌ভেস; কীর্তন না কেত্তন; নিদান না নিদেন; হিসাব, না হিসেব; বুঝা, না বোঝা; প্রত্যাশা, না পিত্তেশ; অমৃত, না অম্রিত; আবৃত্তি,না আব্রিত্তি; জ্যোৎস্না, না জোছ্‌না; যখন, না জখন; যাওয়া, না জাওয়া; ওষুধ, না ওসুধ; বাংলা, না বাঙ্‌লা; টেকা, না টেঁকা এরকম অনেক। এসবের কোনো সমাধান নেই। উত্তর হ'ল, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। কেউ কেউ উচ্চারণে বানানে সমতা আনতে চান। হায়রে, উচ্চারণ আজ যা আছে কাল কি তাই থাকবে? সাহিত্যিকেরা বৈয়াকরণরা একটা মাপকাঠি ঠিক করে করে দেন, তাতেই এক দু শতাব্দী চলে যায় স্বচ্ছন্দে। গোলমাল কিছু তথাপি থেকে যায়। সেক্ষেত্রে বিকল্পের বিধান তাঁরাই দিয়ে দেন। শিক্ষিতেরা তা অনুসরণ করবেন, ছাত্রেরা সেই বিধিতেই চলবে, এটাই প্রত্যাশিত। যদি কেউ তা না করেন, স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানে অবহেলার জন্য যদি ভুলভাল প্রচুর হতে থাকে, তাহ'লে সে দায় প্রশাসন-কর্তৃপক্ষের। ছাত্র ছাত্রীদের ভুল ঠেকাতে ভাষা কমিশন বসাতে হবে এতো আর হতে পারে না। আজ যদি কিছু সংস্কার করাও যায়, তা দিয়ে যথেচ্ছচার ঠেকানো যাবে না, কোনোকালে যায়নি। লেখায় খুব ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে, ব'লে যে সব শিক্ষক বানান ওলটাতে চান, অথচ মূলে অবহেলা করেন তাঁদের কী আর বলা যাবে! বরং অভিভাবকদের বলা যেতে পারে, এদিকে তো উপায় দেখছি না, এখন তাবিজ মাদুলি পরিয়ে দেখতে পারেন ফলোদয় হয় কি না।

সাঁওতালী ও বাঙ্লা

'সাঁওতাল' নামটা সাঁওতালী ভাষার নয়। আমাদের দেওয়া আর্যভাষার শব্দ। ধনুর্ধারী সৈন্য-রূপে সামন্ত রাজন্যদের রক্ষা করত এই ধ'রে সামন্ত-পাল থেকে সাঁওতাল। অষ্ট্রিক অর্থাৎ কোল-মুণ্ডাদের এই শাখার মূল নাম 'খেরোয়াল'। সাঁওতালদের জ্ঞাতি গোত্র হল -হো, শবর, ভূমিজ, খেড়িয়া প্রভৃতি। আর দূর-সম্পর্কিত হ'ল মুণ্ডারা, মধ্যভারতে যারা সংখ্যায় বেশী। একত্রে কোল-মুণ্ডা, সংস্কৃত ভাষায় যাদের 'নিষাদ' বলা হয়েছে। আর নৃতত্ত্ব অনুসারে নাম দেওয়া হয়েছে 'অষ্ট্রিক'। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের সংখ্যা সতেরো লক্ষের মতো। বিহার-ওড়িশাতেও এরা বেশ কিছু রয়েছে। এদের লিখিত সাহিত্য নেই, আছে মৌখিক 'ছড়া' অর্থাৎ কবিতা ও গান। এরা সামান্য কিছু গল্পেরও ('কাথা') অধিকারী। সুনির্দিষ্ট সমাজ-বন্ধন ও পারিবারিক সম্পর্কসহ এদের ছোট ছোট গ্রামে বসতি। আগেকার দিনের বৃত্তি ধান, ভুট্টা, কলাই প্রভৃতির উৎপাদন, হাঁড়ি, সরা এবং সম্ভবতঃ খাটো কাপড় ('কাচা') গামছা তৈরি, গাড়ি, নৌকা ও চালাঘর নির্মাণ, বাঁশের ঝুড়ি, চুবড়ি প্রভৃতির প্রস্তুতি; পশুশিকার, মাছধরা, নৌকা বাওয়া, আর মাদল, খোল, বীণাযন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে নাচ গান। এদের নারীদের পুষ্পপ্রীতি উল্লেখযোগ্য, আর বারো মাসে তেরো পার্বণ এবং সেই সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, পর্বত, নদী, গাছ, এমনকি গৃহস্থালীর বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যেও বোঙা বা দেবতা দর্শন। সন্দেহ নেই এই 'বোঙা' থেকেই বঙ্গ নামের উৎপত্তি। এখনও গ্রামাঞ্চলে বা শালের জঙ্গলের পাশ দিয়ে গেলে এদের বৃক্ষতলবর্তী প্রস্তররূপ দেবতার বহু সাক্ষ্য মেলে। এদের পঞ্চায়েত প্রথায় গ্রাম-শাসন আমরা গ্রহণ করেছি। নিয়েছি অজস্র শব্দ বা বাক্য নির্মাণ রীতির ঋণ, আর নিয়েছি পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রগুলি। এরা একান্ত স্বাবলম্বী। ভিক্ষা করবে না, কারো বাড়িতে পাতা পাড়বে না। সুতরাং সাঁওতালেরা আধুনিক সংজ্ঞা হিসাবে শিক্ষিত না হলেও সংস্কৃতির দিক থেকে নগণ্য ছিল না, অসভ্য বর্বর তো নয়ই।

পূর্বাঞ্চলের আমরা, বিশেষে বাঙালী বিহারীরা, পশ্চিমাগত এবং পূর্বেই দ্রাবিড়-কোল মিশ্রিত মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধের সঙ্গে এই সাঁওতালদের ব্যাপক মিশ্রণে উদ্‌ভূত। খাঁটি বাঙালীদের মধ্যে

কোল বা সাঁওতাল-রক্ত প্রভূত পরিমাণে বহমান। আর আমাদের মধ্যেকার যারা হীনবর্ণ, যেমন, ডোম, বাগদী, বাউরী, লোহার, কাহার, খয়রা, মেটিয়া এদের মধ্যে কোল-রক্ত প্রায় পুরো প্রবাহিত হচ্ছে। এই কারণেই বাঙলা ভাষায়, বিহারী এমন কি হিন্দীভাষায়, ওড়িয়া ভাষায় কোলভাষার অনুবর্তন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, যদিও ভাষার দিক থেকে আমরা মূলে আর্যগোত্রীয় অর্থাৎ সংস্কৃত-জাত ভাষারই অনুগামী।

এখানে পাঠকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। সেটা এই যে, মুষ্টিমেয় পশুপালক ও যাযাবর আর্যেরা, পারস্য থেকে দুশ' বছর ধরে যাঁরা ভারতে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন ও ক্রমে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলেন তারা বিপুল সংখ্যাক দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক অনার্যদের হটিয়ে দিতে পারলেন কিভাবে? এ বিষয়ে এই বলা যায় যে, নাগরিক সভ্যতার অধিকারী দ্রাবিড়ভাষীদের সঙ্গে আর্যদের সংঘর্ষে পরিচয় ঋগ্‌বেদে পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধ বিশারদ ইন্দ্র ওদের দুর্গ বিধ্বস্ত করছেন ও নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে দ্রাবিড়দের প্লাবনে ভাসিয়ে দিচ্ছেন এইরকম। আসলে মনে হয় নবাগত আর্যেরা রথাস্ত্রসহ রণকৌশলে এবং সংহতিগুণে অগ্রগামী ছিলেন, অথচ মননশীল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত দ্রাবিড়েরা ছিলেন পারিবারিক ও শান্ত প্রকৃতির। সিন্ধুর শাখা-প্রশাখায় প্লাবন দ্রাবিড়দের দক্ষিণে ও পশ্চিমে সরে যাওয়ার কারণ হতে পারে। আবার এদিকে সারা গাঙ্গেয় উপত্যকা ধ'রে এমন কি তারও উত্তরে পশ্চিমে যেসব কোল-মুণ্ডারা বসবাস করতেন তাঁরা বহুধা বিচ্ছিন্ন ও স্বভাবে শান্তিকামী নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কাজেই বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণই হয়ত বা শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। এরই অনুবৃত্তি ঘটেছিল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিহার বাঙলায়। নতুবা ঋগ্‌বেদ অনুসারেই দেখা যাচ্ছে যে অঙ্গ-বঙ্গ-মগধে ও ওড়িশার উপকুল ধ'রে দক্ষিণ পর্যন্ত অনার্যদের প্রবল বিস্তার ছিল। এবং এদের জমিজমা অধিকার করতে যুদ্ধের প্রয়োজন একেবারেই হয়নি এমন না হতেও পারে। অশোকের কলিঙ্গজয়ের নিষ্ঠুর হত্যালীলার বিষয় ঐতিহাসিক। যেভাবেই হোক খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সহায়ে ক্রমান্বয়ে আগত পশ্চিমা ও বিনিশ্রিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা বাঙলায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে খেরোয়ালদের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে ভূমি দখল করতে ও নিজ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন, যার ফলে বাঙলায় চর্তুবর্ণ ও নানান মিশ্রবর্ণের উদ্ভব হয়,হটিয়ে দেওয়া অনার্যেরা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য হয়। এই ভাবে দেখা যায়, বাঙলায় বহু শাখা প্রশাখায় বিচ্ছিন্ন সাঁওতালেরা ভাষাগ্রহণসহ জাতিবর্ণ-বিভেদ ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বরণ করে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে দিয়েছে অনেক কিছু। দিয়েছে দশ-বারো হাজার লোকায়ত শব্দ। দিয়েছে সংস্কৃত থেকে পৃথক বাঙলা বাগ্‌ভঙ্গিমা, লৌকিক দেবতা উপদেবতার বিশ্বাস, বারব্রত পালন ও পূজা পদ্ধতি, পঞ্চায়েতি গ্রাম-প্রশাসন ও সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, আর নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত মানুষের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক সেবাকার্যের ফলে উচ্চবর্ণের সহজ আত্ম-উন্নয়নের সুবিধা।

এবার ভাষার কথা ধরা যাক্। মূলে বাংলা ভাষা নিঃসন্দেহে সংস্কৃতেরই অপত্যস্থানীয়। যেমনটা পশ্চিমা হিন্দী, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি। কিন্তু যেহেতু ভাষা কালক্রমে মুখে মুখে আপনা থেকে বদল হয়। আর বিশেষ বদল হয় অন্য ভাষার সঙ্গে মিশ্রণে, তেমনই এগুলিও হয়েছে। সংস্কৃতের মধ্যেই এককালে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সে শব্দগুলি অনুস্বার বিসর্গ ঢাকা দিয়ে বেমালুম সংস্কৃতের রূপ নিয়েছে। তা-ই স্বাভাবিক, কারণ, এদেশের নিসর্গ, জীবজন্তু চাষ-আবাদ, জিনিসপত্র এবং ভাবনা-চিন্তার ধারা তাদের কাছে ছিল নোতুন। আর বাহক শব্দ তাদেরই কাছ থেকে ঋণ হিসাবে নিতে হয়েছে। আমরা আইন-আদালত, জীবনযাপনের রীতিনীতি বিষয়ক প্রায় হাজার তিনেক শব্দ ফারসী ও ফারসী মারফৎ আরবী থেকে নিই নি? নোতুন নোতুন জিনিস, ফল-ফুলবাচক শব্দ (শ' দুয়েকের মতো) পোর্তুগীজ থেকে নিয়েছি। আজও কত শব্দ ইংরেজি থেকে আমাদের নিতে হচ্ছে। এ হল ভাষার স্বভাবধর্ম। তেমনি কোল-মুন্ডাদের বহু শব্দ পূর্বাঞ্চলের হিন্দী বাঙ্‌লা ওড়িয়াতে ঢুকে গিয়ে ক্রমে বেমালুম আমাদেরই হয়ে পড়েছে। যাঁরা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আগে আলোচনা করেছেন তাঁরা, কোল-মুণ্ডা ভাষা না জানা থাকার জন্য ঐ সব শব্দকে সংস্কৃতেরই এমনটা কল্পনা ক'রে নিয়েছেন। মদ্‌গুরু সুনীতিকুমার যখন ভাষাতত্ত্বর বই লেখেন তখনও সাঁওতালী অভিধান ব্যাকরণ ছাপানো হয়নি। হ'লে পর তিনি যে সব শব্দকে দেশজ ব'লে চিহ্নিত করেছেন তার অনার্যমূল তখনই তিনি ধরে দিতে পারতেন। আর সন্দেহক্রমে যে সব শব্দকে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন সংস্কৃতের একটা আনুমানিক রূপ দিতে তাও তিনি করতেন না। দেখা যায় আমাদের 'চালা' ঘর নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ, আরণ্য গাছের নাম, মাছের নাম, বহু খাদ্যবস্তুর আখ্যা, চাসবাসের যাবতীয় উপকরণ, হাঁড়িকুড়ি, ঝুড়ি চুবড়ি, সাংসারিক সম্পর্কের বেশ কিছু আখ্যা, আর ধ্বনিবাচক শব্দ, শব্দের দ্বিত্ব, কারক চিহ্ন, কারকের সহায়ক শব্দের অনেকগুলিই সাঁওতালদের কাছ থেকে পাওয়া। তাছাড়া, পুরানো বহু গ্রাম নামও রয়েছে। আবার একটা শব্দের আধখানা আর্য গোত্রের আধখানা সাঁওতালী এমনও অনেক। সব মিলিয়ে গ্রামীণ মানুষের নুখে ব্যবহার করা হয় অন্ততঃ হাজার বারো। আর শহুরে শিক্ষিত মানুষের মুখে অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার। সাঁওতালরা কালক্রমে আরবী, ফারসী, ইংরেজি থেকেও আমাদের মধ্যস্থতায় অবশ্য বহু শব্দ নিয়েছে। নিয়েছে সংস্কৃত-গোত্র থেকেও। সেসব বাদ দিয়েই ধরছি। এখানে কেবল অ,আ, ধ'রে কতগুলো শব্দের তালিকা দিচ্ছি। আঁ বা হাঁ, আবট (যে বলদকে এখনও জোয়াল ধরানো হয়নি), আবাসী, আছাড়, আছড়া, আচকা (=আচমকা), আড়, আড়াল, আল(মাঠের), আড়ল (আড়ং), আড়ি, আগাম, আগামী (সংস্কৃত + সাঁও) আগড়া (অগ্রবতী?), আই (=মা, নদীর নামে যেমন –ধলাই, কাঁসাই, শিলাই, মানুষের পক্ষেও যেমন বড়াই, ধাই = ধাত্রী + আই), আইঢাই, আছাড়(=উজাড়), আখা (=উনান), আকাট (=আকাট মূর্খ), আক্রা, আকুলান (অকুলান।'কুলানো' সাঁও), আলা (ক্লান্ত হওয়া), আলজিভের আল (আলাঙ=জিভ), আলাড়িয়া (আলাল, আলালের ঘরের দুলাল), আলো

(নিষেধে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন), অঢেল, আমড়া, আনাড়ী,(=অনভিজ্ঞ), আন্ডিল (=প্রচুর ধনসম্পদ) আঁদাড় পাঁদাড়, আন্ডিআ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন= এঁড়ে। দ্রাবিড়ও হতে পারে), অঙ্কুর (দ্রাবিড়ও হতে পারে), আঁটা (কুলানো), আপায় (দোষ ক্ষতি), আড়া, আড়ি (মাপ বিশেষ),আড়াশ (ধান খড়ের গাড়ির উপর যে দন্ড দিয়ে বাঁধা হয়), আড়িস (বিরোধ), আরজানো (উপায় করা, জন্মানো।=অর্জন?), আড়কাঠি (কুলি সংগ্রহকারী। 'আর্কট' শহরবাসী, অতএব মূলে দ্রানিড়), আঁসকে (পিঠা বিশেষ),আসাম উসুম (সামসুম=মিটে যাওয়া), ওৎ পাতা (অৎ=সুযোগ), আটঘাট, অলিগ্লি,আটা (ময়দা)আঁটাআঁটি, আঁটি (ধানের) আঁটসাঁট, আঁটকুড়া (অপুত্রক। কুড়া=বালক), আটচালা (যে চালার বারান্দা অংশ নিচু, আটটা চালা নয়), আটকানো, আটে পিঠে দড়= আঁটে, আইও=মা ইত্যাদি। থ, ফ, ছ ইত্যাদি আদ্যক্ষর বিশিষ্ট শব্দে আরও অনেক বেশী।অভিধানকারেরা জানেন না যে, ছোট, ছাই ছলকা, ছিটানো প্রভৃতি শব্দ সাঁওতালী। তাঁরা জানে না যে, জিনিসপত্র,মালপত্র প্রভৃতি শব্দের 'পত্র' শব্দটা সাঁও পত্রঃক্ শব্দ থেকে, অর্থাৎ মূল বস্তু শাখা-প্রশাখা স্বরূপ বস্তু তাঁরা জানেন না যে, পাকামি, জেঠমি ইত্যাদির 'আমি'র মূল সাঁওতালী 'আমিঞ্' তেমনি পাঁশুটে, তামাটে এসবের 'টে' শব্দও। কবিতায় গানে আমরা প্রায়ই গ, গো শব্দ ব্যাবহার করি। এরও মূল সাঁওতালী। 'গো' শব্দে মতো, আর 'গ' বাক্যার্থে জোর দেওয়ার বা সুনিশ্চিত রূপ দেওয়ার শব্দ। 'তুমি কি বারো আনায় ওটা দিয়ে পারবে'? উত্তর –না গ। মাউগ, মাগ শব্দের 'গ' টাও ঐভাবে, সংস্কৃত মাতৃ +সাঁও গ। তেমনি আমাদের বহু ব্যবহৃত 'ত' 'তো' শব্দটাও। ওর মূল সাঁও 'দ' যা ওদের প্রায় বাক্যেই ব্যবহৃত হয়। বাঙলায় ওর সিদ্ধ প্রয়োগ বাঙলাকে বলশালী করেছে। 'তবে যে', 'না তো কী', আমি তো জাব না' ইত্যাদি। সাঁওতালী অধিকরণ বাচক 'রে' ওড়িয়ায় দেখা যায়- ঘররে, রথরে। সাঁও 'পুরী' মানে সমুদ্র। বাঙলার 'সাথে', 'পানে' শব্দও ওদের থেকে। 'উল্টা' 'পালটা'ও অদের।হিন্দী 'সা' 'সে' –এ্যায়সা, জ্যায়সা, তুমসে, রামসে। সাঁওতালী 'সাএ' শব্দ থেকে। বাঙলা হিন্দীর 'পয়সা' শব্দটা কিভাবে হ'ল? সংস্কৃত পোত= সন্তান, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে 'সা' অর্থাৎ সংলগ্ন, নিকট। পোত্র + সা অর্থাৎ বাচ্চাদের গায়ে যে তাম্রখন্ড ঝোলানো থাকে তার মত যে মুদ্রা দেখতে। সংস্কৃতে প্রহার করার বিকল্পে 'মার' ধাতুর ব্যবহার পরে চালু হয়েছে। সে যাই হোক, প্রহার করার 'মারা' আর পকেটমারা, চাল মারার 'মারা' তো একই ব্যাপার নয়। এই 'মারা' সাঁওতালী শব্দ, হীন কর্মের অর্থে। আমরা বলি 'সাপে খেয়েছে'। সাপের কামড়কেও খাওয়া বলব কেন? বলব এই কারণে যে সাঁও 'খা' ক্রিয়ার অর্থ হ'ল পিচকারির মত কিছু প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে তা হ'ল বিষ।

ভারি মজার একটা শব্দ আছে- আপন, আপনা এবং আপনি। এর মধ্যে আপন আপনা আত্মবাচক, আর 'আপনি' প্রথম পুরূষের সম্মানবাচক। আমরা মনে করেছিলাম দুয়েরই মূল আত্মন্ অর্থাৎ 'নিজ'? কিন্তু কী করে তা হবে? দ্বিতীয় 'আপনি' এসেছে সাঁওতালী 'আপে' অর্থাৎ 'তারা' + হুনি অর্থাৎ "ঐ বিশিষ্ট তারা" এই অর্থে। হিন্দীতে 'আপ্' কেবল 'আপে' থেকেই এসেছে।

'ছাই' শব্দের মূল অর্থ হ'ল মিথ্যা, যেমন "করবে, না, ছাই"। ছুঁচো শব্দ সাঁওতালী মূলে অর্থ হ'ল ঘৃণার্হ ব্যাক্তি। আমাদের ভাষায় ছাই = মিথ্যা ও পাঁশ দুইই। ছুঁচো শব্দে ঘৃণ্য জীবটাও বোঝায়।

আমরা গ্রামের নাম জানি, গ্রামে যাই ও শুনি। কিন্তু নামের পিছনে কোন্ বৈশিষ্ট্য আছে তার তত্ত্ব রাখি না। অনেক নতুন গ্রাম বসেছে, পুরানো নাম বদলে নতুন নামকরণ হচ্ছে কোন কোন গ্রামে। সেগুলোর কথা ধরছি না, ধরছি আজও প্রচ্লিত পুরানো নামের কথা। কোন গ্রামের নাম আলতোভাবে হয় না, বিশিষ্ট কোনো চিহ্ন বা ঘটনা ধরে হয়। প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে আধুনিক শিক্ষার আলো বিলনম্বে প্রবেশ করেছে, সেখানকার বহু গ্রামের নামই 'অড়া' শব্দের। 'অড়া'র অর্থ বাড়ি। যেমন, রাউত = রাজপুত্র = পুলিশ প্রধান, তার বাড়ি= রাওতড়া। সেঁদ =শিকার + অড়া, শিকারের অস্ত্রশস্ত্র ও যাত্রার স্থান = সেঁদড়া। বিরভূম (বীরভূম নয়) এর বির = জঙ্গল + ভূম। তেমনি বিরসিঙা (বীর নয়) = জঙ্গলের সূর্য। বিদ্যাসাগরের গ্রামের নাম।

বাঙলায় বহু অনুকার শব্দের ব্যবহার আমরা করে থাকি। কনকন, ঝনঝন,শনশন, খাঁখাঁ, ধূ-ধূ, কটকট, টকটক,চুপচাপ,ফিসফাস ইত্যাদি শতাধিক। এগুলির সংকলনে প্রথম আত্মনিয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ। দেখা যায় এসবের অধিকাংশেরই মূল সাঁওতালী। সাঁওতালী থেকে মাত্র দু'চারটা ক্ষেত্রে অর্থের সামান্য হেরফের আমরা ঘটিয়েছি মাত্র। তাছাড়া দু'একটা ক্ষেত্রে শব্দের মূল থেকেও আমরা সামান্য পরিবর্তন এনেছি, যেমন সাঁওতালীতে ফুস্ফুস্, আমরা বলি ফিসফাস, সাঁঅতালীতে চাপচুপ (=কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা), আমরা উল্টে নিয়ে বলছি –চুপচাপ।খুবই লক্ষনীয় কথা হ'ল- আমাদের ক্রিয়ামূলে একটা 'আ' যোগ থাকে। যেমন সংস্কৃত প্রাকৃতের কর্, পড়্, চল্, শুন্, দেখ্ প্রভৃতিকে বাঙলায় বলি-করা, চলা, পড়া, দেখা, শোনা ইত্যাদি। এই আ-যোগ সাঁওতালী প্রভাব-জাত। সাঁওতালীর নিয়ম হ'ল- যে কোনো শব্দেই 'আ' যোগ ক'রে তাকে ক্রিয়াপদ করে নেওয়া যায়। হিন্দীতেও তাই দেখি, তবে অন্ +আ যোগে, যেমন –করনা,দেখনা, পঢ়না, শুননা ইত্যাদি। মূল সংস্কৃতে বাক্যমধ্যে কোন্ পদ কোথায় বসবে তার বাঁধাধরা কোনো নিয়ম নেই। হিন্দী,বাঙলা ওড়িয়াতে এর নিদির্ষ্ট নিয়ম আছে। মূল নিয়মটা হ'ল কর্তা প্রথমে বসবে, ক্রিয়াপদ সবশেষে। এটিই সাঁওতালীর নিয়ম। তবে ভাষাবৈচিত্রের জন্য, জোর পড়ার নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে কিছু বিচিত্রেরও অবকাশ আছে। সাঁওতালীতে আছে, বাঙলা হিন্দীতেও আছে। তবে একটা বিষয়ে সাঁওতালীর সঙ্গে এদের তেমন মিল নেই। সেটা হ'ল এই যে, সাঁওতালী ভাষায় একই সঙ্গে বিশেষণ ক্রিয়া-বিশেষণ কর্ম ক্রিয়া ও কর্তৃবাচক সর্বনাম সংক্ষিপ্ত ক'রে একসঙ্গে জট পাকিয়ে তোলা হয়। বিভক্তি প্রত্যয় যোগ করে আলাদা আলাদা রাখা হয় না। বাঙলায় তা নয়, বিশ্লেষণ নীতির আশ্রয়ে শব্দগুলোকে বিভক্তি-প্রত্যয় যোগ সহ পৃথক্ রাখা হয়। তবে আধুনিক সাঁওতালীতে দেখছি জট-পাকিয়ে তোলা কমে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ বাঙলা, হিন্দী, ওড়িয়ার প্রভাবে।

সাঁওতালীতে ‘ছড়া’ অর্থাৎ কবিতার সংখ্যা প্রচুর।মুণ্ডারী ভাষাতেও তাই দেখা যায়। বিদেশীরা এবং বর্তমানে স্বদেশী দু’চার জন এসব সংগ্রহ করছেন। আধুনিক সাঁওতালী কবিতায় আধুনিক ভাষাগুলির ও সামাজিক বিস্তার প্রভাব পড়েছে। অন্তত আশি একশ’ বছর আগেকার – কবিতায় তা ছিল না। আজ তারও আগেকার কবিতাই সাঁওতালদের নির্দিষ্ট মনোভাবের অনেকটা দ্যোতনা করে। পুরানো ঝুমুর গানের ছন্দ, তাল,সুর-সাঁওতালী রীতির। পরে ঝুমুরের উপর কীর্তন-বাউল সুরের প্রভাব পড়েছে। তবে সুরের দিক থেকে বাউল মুলে সাঁওতালী হওয়াও বিচিত্র নয়। আমরা যাকে চার মাত্রায় ‘ছড়ার ছন্দ’ বলি তা সাঁওতাল-প্রভাবিত নিঃসন্দেহে। সাঁওতালী ছড়া অর্থাৎ কবিতা কতদূর কাব্যিক এবং আধুনিক রোম্যান্টিক কবিতার প্রতিযোগিতা বোঝাতে একটি কবিতার মর্ম উপস্থাপিত করে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করি। যেমন আমাদের আগেকার সমাজে তেমনি সাঁওতাল সমাজেও বিয়েতে সচরাচর মেয়েদের কোনো অভিমতের অপেক্ষা রাখা হত না। তবে ভালোবাসা করে পালিয়ে যাওয়া এবং ফিরে এসে পঞ্চায়েতে ফাইন দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা অবশ্য দেখা যায়। বিয়ের ব্যাপারে সিঁদুর ছিল একটি বড় প্রতীক চিহ্ন। যাই হোক, অভিভাবদের মধ্যস্থতায় জোর করে বিয়ে দেওয়া একটি মেয়ে তার পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে কলসীতে জল আনার পথে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার বলছে-“পথ আগলে কেন আর দাঁড়াও, নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে এখন আমি নিরুপায়। হায়, আমি যখনই জল আনতে বের হই, সারা পথ তোমার কথাই মনে করি। এক এক সময় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, যা হবার হোক, কারো কথাই আমি শুনব না, কোনো বাধাই আমি মানব না”। একটি ছড়ায় দেখি- “আদি কালে আমাদের মনের কথা পাথরে লিখে রাখার নিয়ম ছিল। বাইরের শত্রুরা এল।তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গিয়ে আমরা বনে পাহাড়ে চলে গেলাম। সেই সঙ্গে আমাদের মনের কথা মনেই থেকে গেল”। কে জানে এই আক্ষেপের সত্য লুকানো আছে কি না।

বাঙলার গ্রাম-নামের উৎস নিরূপণ

গ্রাম-নামের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করতে ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান ও নিসর্গ-প্রকৃতির সামঞ্জস্য মিলিয়ে দেখতে হয় এবং সেই মিলিত বিচার থেকেই অন্তত শতকরা পঁচানব্বইটি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে, এসে পৌঁছানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে এও বুঝতে হবে যে বিশিষ্ট কোনও একটি চিহ্ন ধরেই জনমানস স্থান ও গ্রামের পরিচয় দেয় ও সেই পরিচয় নিজমনে মুদ্রিত করে রাখে। একটি স্থান থেকে অন্য স্থানকে পৃথক করে নেওয়ার মূলে ঐ বিশিষ্ট চিহ্ন কাজ করে। যেমন ধরুন চন্দননগরের কাছের 'ফরাসডাঙ্গা' ফরাসীদের অধিকার ও বাসভূমি ধ'রে। বিল্ব অর্থাৎ বেলগাছের প্রাচুর্য ধ'রে বিল্বপুট বা পুষ্ট থেকে বেলুড়। গোপ সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিদের বসতি ধ'রে গোপবাটী= গোয়াড়ী। প্রথম কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকৃত ও বর্ধিত নগর ধ'রে কৃষ্ণনগর। বেতগাছ যুক্ত গড় বা দুর্গ খাত ধ'রে গড়বেতা। জোড়া বটগাছের চিহ্ন ধ'রে বড়জোড়া। জগতী অর্থাৎ মনসার ক্ষেত্র ধ'রে জগতীতল=জগদ্দল। কারও স্থাপিত ফুলের বাগান তথা গৃহ ধ'রে ফুলবাড়ী। কখনও কখনও দুই গ্রামের একই নাম হওয়ার কারণে পাশের গ্রামের সঙ্গে যোগ ক'রে নিয়ে গ্রামটিকে বিশিষ্ট চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন, কোন্ কৃষ্ণনগর বলছেন? বগড়ী-কৃষ্ণনগর অথবা গোয়ড়ী কৃষ্ণনগর। তেমনি কোন্ গোবিন্দপুর? তার উত্তরে ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর –ইত্যাদি। এই ভাবে বিশিষ্ট স্থানদ্যোতক চিহ্নের সঙ্গে ভাষা পরিবর্তনের সূত্র মিলিয়ে নিয়ে তবেই আগেকার দিনের গ্রামনামের সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব। আমরা প্রথমে মহানগরী 'কোলকাতার' কথা দিয়েই না হয় আলোচনা আরম্ভ করি।

ইংরেজ কোম্পানির শহর কোলকাতা গঠনের বহু আগে গ্রাম 'কলিকাতা' অর্থাৎ 'কইলকাতা' যে ছিল তার প্রমাণ মধ্যযুগের পুঁথিতে মিলছে, মিলছে আইন-ই আকবরী গ্রন্থে। 'কইলকাতা' শব্দের লিখিত রূপ 'কলিকাতা'। কারণ শব্দ মধ্যেকার ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে ই বা উ স্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকলে লিখনের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে 'ই' বা 'উ' কে পরবর্ণে যুক্ত করে দিতে হবে। যেমন 'আউস'=আশু চাউল=চালু, মইষ(মহিষ)= মষি ইত্যাদি। অতএব, কলিকাতার কলি উচ্চারণে হবে

‘কইল’। কইল শব্দের অনিবার্য মূল হ’ল ‘কপিল’ অর্থাৎ বাঙলার ট্র্যাডিশান ধ’রে কপিল মুনি। এর পরে যুক্ত শব্দ হ’ল ‘কাতা’। এ কাতা দড়ির কাতা হতে পারে না। আসলে এটি ‘খাতা’ শব্দের পরিবর্তিত রূপ যে খাতা আমরা লিখতে ব্যবহার করি তা ফারসী শব্দ, তার এক্ষেত্রে কোনো সংগতি নেই। অন্য এক ‘খাতা’ শব্দ সাঁওতালী ভাষার। যার অর্থ দল বা গোষ্ঠী। সুতরাং কইল + খাতা হ’ল কপিলের দল বা সেই দল চিহ্নিত গ্রাম। ভূগোলের সঙ্গে মিলে যায়, যেহেতু সেই দু’ তিন হাজার বছর আগে কোলকাতার কাছেই সমুদ্র ছিল এবং গঙ্গা এখানেই সমুদ্রে মিশত। এখানে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ও পুরানো ঐতিহ্য স্মরণ করে আমরা কইলকাতা=ক’লকাতা=কোলকাতার সঠিক সমাধান পেলাম। ‘কইল-কেতা’ নাম কইলকাতার অপভ্রংশ বা আল্‌গা উচ্চারণ মাত্র। এ বিষয়ে পূর্ব প্রস্তাবিত –কলিচুনের ‘কলি’ এবং কাতার দড়ির ‘কাতা’ অথবা ‘কলি’ অর্থে চোর ডাকাত –এই সমাধান আমি গ্রহণ করতে পারছি না।

কিছুকাল পূর্বে স্বর্গত ডঃ সুকুমার সেন ‘বাঙলার স্থান-নাম’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। তাতে কেবল ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর ক’রে তিনি শতাধিক গ্রাম-নামের মূল ধরতে চেয়েছেন। কোথাও কোথাও যে মেলানো যাচ্ছেনা, তা তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছেন, তবু যে প্রয়াস করেছেন তার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তবে আমরা মনে করি ঐতিহ্য, বিশিষ্ট চিহ্ন ও সমাজ বা নিসর্গের পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তবেই নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যেতে পারে। তাঁর নির্ণয়গুলি সামনে রেখেই আমরা আরও সঠিক পরিস্থিতিতে পৌছানোয় প্রয়াস করব। ভাষাতত্ত্বের নিয়মের অনুসরণ আমরা অবশ্য চাইব, কিন্তু যে ক্ষেত্র তা ঐতিহ্য বা জনমানসের বিরোধী হবে সে ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা ক’রে সঠিক পরিস্থিতিতে উপনীত হবার প্রয়াস করব। অগণিত দৃষ্টান্তের মধ্যে দিগ্‌দর্শন কল্পে কয়েকটি মাত্র এখানে আলোচিত হচ্ছে। এ থেকে গ্রাম-নামের উৎসে যে নানান্‌ বৈচিত্র্য রয়েছে তা উপলব্ধ হবে। দেখা যাবে, গ্রাম-নামের কিছু সহজ বোধ্য, কিছু স্থান, কাল, নিসর্গবস্তু বা মানবসম্পর্ক নির্ধারণের সাহায্যে বোধ্য আর কিছু দুর্বোধ্য, সুতরাং ভৌম-পরীক্ষণ ও গবেষণায় সাহায্যে বোধ্য। সহজবোধ্য, যেমন, শালবনী, দাসপুর, উলুবেড়িয়া, কামারপুকুর, জয়পুর, মানবাজার, শ্যামপুর প্রভৃতি। দুর্বোধ্য, যেমন, মগরা, হাড়োয়া, গলসী, রতুয়া, চুরুলিয়া, মেজিয়া, তিলুড়ি, আকুই, ভাবতা প্রভৃতি। আমরা এখানে তেমন শব্দ বেছে নিয়েই আলোচনা করব যা স্বল্প সমাজবোধ ও স্থানীয় ভূপ্রকৃতি ও ভাষাবিজ্ঞান-বোধের মিলিত সাহায্যে নিশ্চিতভাবে আয়ত্তগম্য।

আসানসোল- প্রকৃত শব্দ ‘আসনশোল’। ইং দৃষ্টে উক্ত ভুল লেখা হয় ও উচ্চারিত হয়। ‘আসন’ গাছ বিশেষ, যার কাঠ অস্ত্র শানিত করার যোগ্য। ‘শোল’ হচ্ছে জলজ নরম গাছ, যা কর্ক, ডাকসাজ, টুপি-প্রভৃতির কাজে লাগে। এরই সংলগ্ন ‘শোল জমি’ অর্থাৎ জলা উর্বরা জমি।আসন

গাছ এবং শোল গাছ বা ভূমি ধ'রে ঐ নাম। ইং দৃষ্টে আমাদের কিরকম ভুল হয় তার অন্য দৃষ্টান্ত 'মাসান জোড়'।শব্দটি হ'ল মশান অর্থাৎ শ্মশান + জোড় অর্থাৎ সংকীর্ণ জল খাত। এমন দুই যেখানে দেখা যায় সেই স্থান। আসন এবং শোল দু'টি শব্দই সাঁওতালী।

গুস্করা- মূল শব্দটি সম্ভবতঃ ঘুষ + কড়া অর্থাৎ এক কড়া ঘুষ দেওয়ার স্মরণীয় গ্রাম।

কাঁকসা-সাঁও, কাঁখি = কোনও পাত্রের গোলমত কানা বা মুখের কিনারা। সাঁও, সাত্র = কাছাকাছি, মত। জায়গাটা দেখতে কলসীর কানার মত এই চিহ্ন ধ'রে নাম। তুলনীয় কাঁখি + নাড়া = কাঁখনাড়া, কাঁকিনাড়া।

উখড়া- উখুড় (উদূখল)+ আ। অর্থাৎ যেখানে উদূখলের ভিতর ধান গম পেষাই হয়। অতএব, বিশিষ্ট চিহ্ন ধ'রে গ্রামনাম।

অন্ডাল- সাঁও, আন্ডেলা = ধনী। অর্থাৎ ধনীদের গ্রাম।

মানকর-মান পদবীধারী সেকালের যোদ্ধাদের নামমাত্র কর অর্থাৎ খাজনা যে গ্রামে বিহিত হয়েছে।

বর্ধমান- শব্দটি সংস্কৃতের অনুরূপ, কিন্তু সন্দিগ্ধ। আমরা মনে করি মানপদবী ধারী আগেকার ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা যেখানে 'বদড়ক্' (সাঁও) অর্থাৎ প্রবল এমন স্থান।

মেমারি- স্বর্গত ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় ভেবেছিলেন যে মেয়ে + মার্ + ই থেকে নামটি এসেছে, কিন্তু মেয়েদের ধ'রে মারার ক্ষেত্র তো বাঙলায় প্রায় সর্বত্র। তাই দিয়ে নিদিষ্ট ঐ নাম হতে পারে না। আমরা খানিকটা জেনেশুনে নিয়ে মনে করেছি যে মেম + মারি শব্দ থেকে ঐ রকম নাম। এটি বিশিষ্টতার দ্যোতক। শোনা গেছে ওখানে এক ডাচ্ মিশনারি মহিলা বা মেমকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সুতরাং মেম + মারি =মেমারি।

ভাতার- ভর্ত্তা বা স্বামী থেকে নয়। ভাত + আড় অর্থাৎ ভাতের প্রাচীর তোলা হয়েছিল এমন গ্রাম- ভাতাড়।

শক্তিগড়- স্বর্গত ডঃ সুকুমার সেন ঠিকই ধরেছেন যে শাঁখ + টিকর অর্থাৎ ভাঙা শাঁখ জড়ো করা উঁচু ভূমি যেখানে।

খানা- স্পষ্টতই 'খানা খন্দ' 'খানাডোবার' খানা থেকে।

দামিন্যা-'দামিনী' অর্থাৎ দামযুক্ত মজা নদী, পূর্ব দিকে অবস্থিত দামোর সংলগ্ন উপনদী। তার তীরে যে স্থান তা হ'ল 'দামিনীয়া'= দামিন্যা।

রায়না- রাজ + নাব অর্থাৎ রাজার নৌকা যে স্থানে রক্ষিত হয়েছে এমন দামোদর সংলগ্ন গ্রাম।

কাল্না- কাল + নাথ বা মহাকাল শিবের স্থান যেখানে।

'অম্বিকা-কালনা' ভুলক্রমে চলছে। হবে আম্বুয়া + কাল্না দুই গ্রামের সমাহার। আম্বুয়া= আম + বোয়া থেকে। আমবাগানের জন্য শুল্ক আদায় ধ'রে নাম।

গলসি- সাঁও, শব্দ। গল্ = দম্ভিকতা প্রকাশ + সিঃচ্ = হামবড়াই-কারী ক্ষুদ্র ব্যক্তি সব যেখানে।

ধাইগাঁ-'ধাত্রীগ্রাম' কখনোই নয়। স্বর্গত ডঃ সেন ধরেছেন 'ধাবিক' বা 'ধার্য' শব্দ থেকে 'ধাই'।ধাবিক হতে পারে না, কারণ রজকদের বাস সেখানে ছিল না। লক্ষ্মনসেনের একটি অনুশাসনে ধার্যগ্রাম অবশ্য আছে। কিন্তু 'ধার্য' কোনও নিয়ম অনুসারেই 'ধাই' হতে পারে না। আসলে শব্দটি হচ্ছে 'ধাজি গ্রাম'। 'ধাজি' নামে একটি তখনকার হীনবর্ণের 'জাতির' পরিচয় অবশ্য সাহিত্যে রয়েছে। স্বচ্ছন্দে মূলে এটি তাদের গ্রাম হতে পারে। আর লক্ষ্মণসেনের অনুশাসনে যদি 'ধাজি' শব্দকে সংস্কৃতায়িত করতে 'ধার্য' শব্দ তৈয়ার করা হয়ে থাকে তো গোল চুকেই গেল। 'ধাইগোঁ'র মতো বর্ধমান জেলায় রাইগাঁ, কাইগাঁও আছে। স্বর্গত ডঃ সেন 'রাইগাঁ' এর ব্যুৎপত্তি হিসাবে 'রাজিক-গ্রাম' অর্থাৎ রাই সরিষা উৎপন্ন হয় যে গ্রামে- এটি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু 'কাইগাঁ' সম্পর্কে সুবিচার করেন নি। ওটি কাজীর গ্রাম = কাজীগ্রাম থেকে এসেছে এটিই সব থেকে সম্ভাব্য। এরই পাশের কুলুট এর 'ট' ধরতে তিনি 'কোষ্ঠ' শব্দের সাহায্য নিয়েছেন, অথচ সঠিক হবে 'কূলপুষ্ট' বা দামোদর শাখা খড়ে' নদীর কূল দ্বারা পুষ্ট। তেমনি 'কুলিয়া' গ্রামনামের মূল ধরতে তিনি 'কুলীন' শব্দ গ্রহণ করেছেন। অথচ নদীমাতৃক বাঙলার নদীতীরবর্তী বহু গ্রামের নামই 'কুলিয়া' ছিল এবং এখনও আছে। শব্দটি 'কূল দ্বীপ' থেকে। নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে এক কুলিয়া ছিল, যা ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। বর্ধমানের দামোদরের কূলে এক কুলিয়া= কুল্যে। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের আগে বাদ + কুলিয়া = বাদকুল্লা। 'বাদ' অর্থে রাজস্ব থেকে 'বাদ'-দেওয়া-চরে সদ্য গ'ড়ে ওঠা গ্রাম ব'লে। অবশ্য 'কুলুট' শব্দ- সাঁও কুলহু = কলু বা তৈল প্রস্তুতকারী + হুট = গোঁয়ার এমন বিশিষ্ট কোনও লোকের অবস্থিতি ধ'রেও না হতে পারে এমন নয়। তবে দামোদর শাখা খড়ে' নদীর কূল-পুষ্ট এমন হওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

বারাকপুর- প্রাচীন পুঁথিতে 'বারবকপুর'। সুলতান রূকনুদ্দীন বারবক শাহ কোনও কাছে এখানে এসে ছাউনী ফেলে কিছুদিন ছিলেন। তা থেকে ঐ নাম।

ইছাপুর- পাঠান জমিদার 'ঈশা খাঁ' এর সাময়িক অবস্থিতি ধ'রে ঐ নাম। 'শ' টা 'ছ' হয়ে গেছে বহু ব্যক্তির বিশেষতঃ মুসলিম লেখকদের স, শ-কে 'ছ' দিয়ে লেখার অভ্যাসে।

নৈহাটী- স্পষ্টতঃ নদী + হট্র = হাট অর্থাৎ গঙ্গাতীরবর্তী হাট ধ'রে নাম।

কাঁচড়াপাড়া- 'কাঁচড়া' অর্থে মহুয়ার ফল। তরি-তরকারিতে ব্যবহার্য ছিল। কাঁচড়া পাড়তে গিয়ে কোনও ঘটনা ঘটে থাকবে- তা থেকে ঐ গ্রাম-নাম।

দেনুড়- চৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের শেষ জীবণের বাসভূমি। দৈন্য থেকে 'দেন' এবং পুট বা কূট থেকে উড় শব্দ যে না আসতে পারে এমন নয়, কিন্তু তা কোনও বিশেষ চিহ্নের দ্যোতক এবং চিনতে সহায়ক হতে পারে না। আমাদের ধারণায় দেওন = দেয়ন অর্থাৎ যার হাত দিয়ে জমিদার কর্তৃক দানের বিষয় নির্বাহ হয় এমন ব্যক্তিদের বসতি-চিহ্নিত গ্রাম। আমাদের গ্রামে ঐভাবে দেওন-পুকুর ছিল বাল্যে দেখেছি। 'দেয়নে' বা দানে যে গ্রাম বা পুকুর দেওয়া

হয়েছে এমন অর্থও ধরা যায়। গ্রাম চিনতে এটাই বিশিষ্ট চিহ্নবহ।

প্রত্যন্ত পশ্চিম বাঙলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদ্‌নীপুর, বিরভূম, উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের বেশ কিছু গ্রামনামের মধ্যে সাঁওতালী শব্দ রয়েছে, বা তদ্‌ভব-সাঁওতালী মিশ্রিত শব্দ রয়েছে দেখি। যেমন,

মেদিনীপুর- শব্দটা হবে মেদ্‌নী + পুর। 'মেদ' হচ্ছে প্রাচীন আদিবাসী থেকে হীনবর্ণ হিন্দুর এক জা'ত। তাদের বিশিষ্টা কোন রমণীর বা নারীদের বাসভূমি ধ'রে মেদ্‌নী + পুর। এরকম বহু গ্রাম নাম বাঙলা-সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়ে সহজ বোধ্য ক'রে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

চন্দ্রকোণা- রেনেলের মানচিত্র পাই চান্দের কোনা। আসলে শব্দটি সাঁও চান্ধের = উর্বরাভূমি। কৌনিক পরিবেশে অবস্থিতি ধ'রে 'কোনা'। বাঁকুড়ায় আমাদের গ্রামের পাশে ছোট নদীর তীরে চাঁদুরিয়া = চাঁদুরে গ্রাম। ঐ গ্রামে শাক-সবজী ফসল খুবই ভালো উৎপন্ন হয়। সুতরাং ওখানেও 'চান্ধেরিয়া' থেকে 'চাঁদুরিয়া'।

আড়রা- মূল শব্দ সাঁও. আড়ড়া = আড় +অড়া অর্থাৎ প্রচীরবেষ্টিত গৃহ। আড়রার জমিদার গৃহ। আজও গড়্, প্রাচীর প্রভৃতির চিহ্ন দেখা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ এখানকার জমিদারের আশ্রয়ে থেকেই তাঁর বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন।

কাঁথি- কাঁথ (সাঁও) + ঈ। নূন তৈরির জন্য যেখানে স্বল্প উঁচু পাঁচিল = কাঁথ দেওয়া দেখা যায়।

বিনপুর-সাঁও বিঞ= সাপ + পুর। সাপুড়েদের গ্রাম।

গুচুড়ে- গো + চর + ডিহা (=গ্রাম)।

ঘাটাল- ঘাট (সাঁও) + ওয়াল (ফা)= ঘাটোয়ালের নিবাস। ঘাটোয়াল= ঘাটরক্ষক, ঘাটের শুল্ক আদায়কারী।

হিজলী- হিজল গাছ সমন্বিত বা বেষ্টিত ভূমি।

ঝাড়গ্রাম- কোল মুন্ডাদের শাখা 'ঝাড়'। মূল অর্থে বহু শাখা সমন্বিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তারই নাম-চিহ্নিত সম্প্রদায়, তাদের গ্রাম।

পাঁশকুড়া- রেলগাড়ীর ইঞ্জিননের পাঁশ (ছাই)এর কুড় (কূট = উঁচু করা গাদা)

যেখানে। 'আ' বিশেষণে।

আকনা-আঁকা (সাঁও)= ধনুকের মত আকৃতির না (নাব)= নৌকা যেখানে। আক = আখ, ইক্ষু যুক্ত নৌকা ভাষার দিক থেকে হতে পারে, কিন্তু তা বিশিষ্ট চিহ্নবোধক হয় না।

পিংলা- পিঙ্গলা। মাটির পিঙ্গল অর্থাৎ লালচে রঙ ধরে ? অথবা বিশিষ্ট কোনও নারীর নাম থেকে? যেমন, 'মদনা' বতী থেকে ময়না।

খড়্গপুর-আসল শব্দ 'খড়্কপুর'। 'খড়্ক' নামে কোনও তান্ত্রিক জোগীর অবস্থিতি অনুসারে।'মাদ' পুরের মাদ= মর্দ ও তাই হতে পারে। 'যক্ষ' নাম ও হতে পারে।

জাড়া-সাঁও অর্থ সঠিক একটু কম-বেশি নয়। প্রচলিত বর্তমান প্রয়োগ- 'ঝাড়া পাঁচ কেজি'। গ্রাম নামে অর্থ হবে খাঁটি, শুদ্ধ।

সবং-সাঁও জলময় অর্থে । জলাভূমির গ্রাম?

নড়োজোল-সাঁও নাড়া=খড়-বিচালি+জোল=অগ্নিসংযোগ বা লম্বা উনান।এই চিহ্ন ধ'রে নাম।

এগরা- এগিয়ে যাওয়ার রাহ (ফারসী,=রাস্তা) বা পথ যেখানে।

ডোমজুড়- ডোমদের বসতি + জোড় = জলপ্রবাহ। ছোট জলপ্রবাহের পাশে ডোমদের বসতি- এমন গ্রাম।

বীরসিংহ- বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি। শব্দটা আসলে বির = জঙ্গল + সিঞ্ = সূর্য। সাঁওতালী শব্দ। অর্থ অরণের সূর্য। শব্দটা আমরা নিজের মত সহজ বোধ্য ক'রে নিয়েছি।

বীরভূম- বির = জঙ্গল, অরণ্য। ভূম = ভূমি, ভূম। আরণ্য ভূমি। তেমনি-মান্দের ভুম = মানভুম, ধলদের ভুম = ধলভুম, সিঞ্ বা সিং (সূর্য) পদবীর ক্ষত্রিয়দের ভুম= সিংভুম ইত্যাদি।

সিউড়ী-সাঁও সিয়ড়ী= যে মাটিতে একবার মাত্র কোনও ক্রমে লাঙল দেওয়া গেছে। কাঁকরে পূর্ণ শক্ত ভূমি যেখানে।

সাঁইথিয়া-সাঁও সাঁইতাও= যেখানে (ধান প্রভৃতি শস্য) একত্র জমা করা ও রক্ষা করা হয়।

জউগ্রাম- জতু = লাক্ষা (প্রস্তুত হয় এমন) গ্রাম। স্বর্গত সুকুমার সেন ধরেছেন জৌতুক-গ্রাম। ভাষাতত্ত্বে তাও হতে পারে, তবে জতু ব্যবসায়ের কেন্দ্র হওয়াই আমাদের অধিকতর সমীচীন মনে হয়েছে।

মশাগ্রাম- সহজেই মনে হবে 'মশা' বুঝি? কিন্তু মশা কোথায় না আছে। সুতরাং হবে মশায়ের বা পন্ডিত মশায়ের গ্রাম।

গ্রাম নামের শেষে 'ড়া'=অড়া, ওড়া (সাঁও অর্থ গৃহ, নিবাস) দিয়ে চিহ্নিত বহু গ্রাম নাম বাঁকুড়ায় রয়েছে। এগুলি প্রায়শই তদ্ভব শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত। যেমন- রাউত (= রাজপুত্র = পুলিস অফিসার)+ অড়া =রাউতড়া। 'ক্ষত্র' থেকে খাত + অড়া =খাতড়া, ক্ষত্রিয়দের গ্রাম ইত্যাদি। আবার সেঁদ = শিকার + অড়া= সেঁদড়া নামের সবটাই সাঁওতালী। অর্থ। শিকারের আয়োজন যে বাড়ী থেকে করা হয় তার গ্রাম। প্রারম্ভে আমরা বাঁকু + অড়া যোগে বাঁকুড়া নামের ব্যুৎপতি দিয়েছি। বাঁকু সম্ভবতঃ মল্লভূম রাজের কোনো প্রতিনিধির নাম। কিন্তু বাঁকা, বাঁকু, বাঁকারায় ধর্মঠাকুরের নাম যে না হতে পারে এমন নয়।আরও দেখতে হবে যে 'বাঁকুড়া' আখ্যার নামপদবীও ঐ অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম নামের শেষে জলপ্রবাহবাচক তোড়, তোড় + আ দেওয়া কয়েকটি গ্রাম নাম রয়েছে।এগুলি প্রথমাংশ সংস্কৃত শব্দজাত। যেমন, শালতোড়া= শাল জঙ্গল + তোড় গ্রাম মধ্যবর্তী জলপ্রবাহ যা বর্ষাকাল ছাড়া সব সময়েই শুকনো ও বালুকাময় থাকে।'শালতোড়া' আদি চন্ডীদাসের জন্মভূমি। আমি গিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে হাজার

বছরের দেব-যক্ষাদির ক্ষয়িত মূর্তির সঙ্গে বাসলী (=বাগীশ্বরী) প্রস্তর মূর্ত্তিও দেখে এসেছি। সে গ্রামে রজক বা রঞ্জকদের নিবাসও বহু দিন থেকেই আছে। যে গ্রামে আমার জন্ম। তার নাম বেলিয়াতোড়। নামার্থ বালুকাময় প্রবাহ। বর্ষায় অবশ্য গৈরিকময় ঘোলা জলের প্রবাহ আসে। স্বর্গত ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য গ্রামে না গিয়েই আন্দাজ করে 'বেল' গাছ ধ'রে নামের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন! তেমনি বেলিয়াতোড়ের কাছে 'ছান্দার' গ্রামের নাম মূল হবে ছন্দঃকার-গ্রাম। অর্থাৎ বিষ্ণুপুর রাজের মন্দিরাদির শ্লোক রচনা ক'রে দিতেন এমন ব্যক্তির দান হিসাবে প্রাপ্ত গ্রাম। স্বর্গত ডঃ সেন দেখেছিলেন যে বৈদিক অভিধানে পাওয়া যায় ছন্দ = বট গাছ। সেই ধ'রে তিনি 'ছান্দার' বলতে বট গাছ চিহ্নিত গ্রাম বুঝেছেন। কিন্তু বট গাছ তো বহু গ্রামেই থাকে। যাই হোক এসব ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কোনো নাম সেই স্থানের বা গ্রামের বিশিষ্ট চিহ্নবাহক হচ্ছে কি না। না হ'লে কেউ তা মনে রাখবে এমন মনে হয় না। প্রসঙ্গ ক্রমে আরও দু।চারটি গ্রামের নামের সম্ভাব্য সূত্র নিয়ে আলোচনার পর এ বিষয়ে ছেদ টানছি।

কোতুলপুর- কোতোয়াল পুর। সুবাদার ও নবাবদের অধীন কোতোয়ালের (পুলিস প্রশাসন কর্তা) নিবাস-চিহ্ন ধ'রে গ্রাম নাম।

ক'নেমারা-কন্যামারা। বিয়ের কনেকে হত্যা করা একটা বিশেষ ঘটনা। তা থেকেই ঐ গ্রাম নাম।

পুরুলিয়া- সম্ভবতঃ পুরুনিয়া। পূরণ= সাঁও পুরুল। অর্থ প্রচুর, যথেষ্ট। খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের প্রাচুর্যের স্থান হিসাবে পুরুন + ইয়া।

চুরুলিয়া- সাঁও চুরৌ= শাসিত করা, বশে আনা। শাস্তি দিয়ে বশে আনা হয়েছে এমন গ্রামবাসীর গ্রাম।

বহুলাড়া- বাঁকুড়ার গ্রাম, 'বহুলা' নামের তান্ত্রিক দেবীর মন্দির যুক্ত।

চুঁচুড়া- চুঁচু বা চেঁচু = মুথা যুক্ত ঘাস বিশেষ। যে ভূমিতে তা পাওয়া যায় তাই ধ'রে 'ল' প্রত্যয় যুক্ত ও ড় উচ্চারিত।

হুগলী- হোগলা ঘাসের প্রাচুর্য হিসাবে ঐ স্থান নাম এমন মনে হয় না। বরং নূনের গোলার অবস্থিতি ধ'রে পোর্তুগীজদের দেওয়া 'ওগোলী' নাম থেকে আসাই বেশি সম্ভব।

শান্তিপুর- ফারসী "সন্ত্ (=সাধু-সন্ত)-ই- পোর" অর্থাৎ সাধুসন্তদের পুরী এই অর্থে।

বহরমপুর- সম্ভবতঃ 'মহরম' শব্দ রাজস্ব-বিভাগীয় কোনও লেখকের দোষে বহরম হয়ে পড়েছিল। 'বহরম' কোনও ফকির-দরবেশের স্বকীয় আখ্যাও হতে পারে, যদিও 'বহরক' অর্থহীন। কেউ কেউ মনে করেন এখানে গঙ্গার উপর নৌবহর থাকত ব'লে ঐরকম নাম। আবার মনে হয়, বহ = বহন করে রহম অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা এই ধরে ঐ নাম। আমি শেষের ধারণাতেই আমার স্বাক্ষর রাখছি।

চাইবাসা, চাঁবাসা- চাঁই (সাঁও)= নেতা। তার বাসগৃহ ধ'রে ঐ নাম।

রতুয়া- রতু (সাঁও)= বৃক্ষবিশেষ। এই গাছের প্রাচুর্য যুক্ত স্থান।

ছাতনা-বাঁকুড়া জেলায়। তদ্‌ভব শব্দ। 'ক্ষত্রিয়নাথ' এই নামের শিব-দেবতা ধ'রে গ্রাম নাম। ক্ষত্রিয়নাথ = ক্ষত্রিনাথ= ছত্রিনাথ = ছাতিনা, ছাতনা।

ওন্দা-তদ্‌ভব। 'অন্ধক' শব্দ থেকে। হয়ত বহু আগে ঐ গ্রামে একাধিক অন্ধ লোকের বসতি ছিল। 'অন্ধ' অর্থে কাজে কর্মে ভুল পথে চলাও হতে পারে।

আশুড়িয়া- তদ্‌ভব। 'অশ্ববাটী'। সামন্ত রাজাদের ঘোড়াশাল ধ'রে গ্রামের নাম।

ভড়া- 'ভট্র' দের নিবাস ধ'রে? তদ্‌ভব? অথবা সাঁও ভড়= ধর্ম ঠাকুরের পূজারী ভিক্ষুক। 'আ' =যুক্ত স্থান অর্থে।

সোনামুখী- সোনা দিয়ে মোড়া মুখ এমন জৈন যক্ষিণীর মূর্তি ধ'রে গ্রাম নাম। ঐ মূর্তি আজও বিদ্যমান।

মেজিয়া- মেঝিয়া, মাঝিয়া মূল শব্দ, 'মাঝি' অর্থাৎ সাঁওতালদের গ্রাম-প্রধান। তার বসতি ধ'রে মাঝি + ইয়া।

লখ্যাড়া- 'লখিয়া' অর্থাৎ লক্ষী + কোনও শব্দের সংক্ষেপে লখিয়া = লখ্যা + অড়া অর্থাৎ তার বাড়ী ধ'রে নাম।

সিমলা পাল- 'সিম'- মোরগ বিশেষ। সম্ভবতঃ ধান রোপণের উৎসবে মোরগ বলি দেওয়ার ক্ষেত্র হিসাবে অথবা মোরগ পালনের স্থান হিসাবে নাম।

ভেদৃয়া শোল- ভেদওয়া = জলাভূমিতে উৎপন্ন হয় এমন গাছ বিশেষ।

যে জলা ভূমি(শোল) এমন গাছে পূর্ণ দেখা যায়।

তালডাংরা- তাল গাছ পূর্ণ ডাঙ্গা বা উচ্চভূমি থেকে।

গোটান-তদ্‌ভব শব্দ। গো + স্থান। দুপুরের দিকে গোরুর পালের বিশ্রাম স্থান ধ'রে গ্রাম নাম।

মালদহ-মল্ল = মাল জাতি। তাদের কারোর অধিকৃত দহ = বৃহৎ জলাশয় (হ্রদ) যেখানে।

গাজোল- গাজের (ফারসী)= ঘনবাতি যুক্ত। অথবা বিশেষ জাতীর মাছের প্রাপ্তিস্থান? সাঁও 'সাঁও 'গাজল'= ঝিলে পাওয়া যায় এমন মাছবিশেষ।

বান্দোয়ান- বান্দো (সাঁও)= বীজ থেকে তেল হয় এমন ফল বিশেষ + ফারসী-বান্= যাতে থাকে, এমন স্থান।

হাওড়া- হাবড়া। সাঁও 'হাবড়াও' অর্থে পৌঁছানো, নিকটবর্তী হওয়া। উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যায় এমন গ্রাম।

কাকদ্বীপ- 'কাক' পদবীধারী ব্যক্তিদের অধ্যুষিত দ্বীপ।

কুলপি- কুলুপী । আরবী কুফ্‌ল্ = বাঙ্ কুলুপ = তালাচাবি। তা যেখানে প্রস্তুত হয় এমন গ্রাম।

হরিনাভি- মূল শব্দ একেবারে বদলে গেছে এবং অর্থহীন হরি + নাভি বোধের জন্ম দিচ্ছে। স্বর্গত

সুকুমার সেনের মতে 'হরিনাপিত' শব্দ থেকে ঐ নাম। এ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করা যায় না। শব্দটি আসলে হরি = গৌরহরি, গৌরাঙ্গ + নাবী অর্থাৎ নৌকা। অর্থাৎ যে নৌকায় শ্রী চৈতন্য ভাগীরতী থেকে সুবর্ণ রেখার তীরে পৌঁছান। ছত্রভোগের জমিদার রামচন্দ্র খান এই ব্যবস্থা করে দেন। সেই থেকে ঐ নৌকা যে স্থানে পূজিত হত সেই স্থানের নাম 'হরিনাবী' বিকৃত রূপ 'নাভি'।

পরিশেষে কোলকাতার আশপাশের ও অন্য কয়েকটি শব্দ। এখানে সামান্য প্রয়াস মাত্র করা হ'ল। আভিধানিক গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। কিন্তু তার পূর্বে বহু অনুসন্ধান করতে হবে।

বৌবাজার- বধূ + বাজার। তাঁর প্রতিষ্টিত অর্থে। বাগবাজার- 'বাঘ' পদবীধারী প্রতিষ্ঠিত বাজার।

মৌলালি- মওলা = কর্তা, শিক্ষা গুরু + আলী = সর্বোচ্চ, প্রধান, মুখ্য।

কসবা- আরবী শব্দ। অর্থ নগর-সন্নিহিত বড় পল্লী।

চেতলা- চিত্র + নাব = না, লা। চিত্র-বিচিত্র নৌকা যুক্ত স্থান।

হেদুয়া- হাদুআ = হ্রদযুক্ত।

ঠন ঠনিয়া- সাঁও ঠনঠন = শুষ্ক ভূমি + ইযা = যুক্ত।

মেটিয়াবুরুজ- মাটিআ = মৃত্তিকা নির্মিত +বুরুজ (সাঁও)= দূর্গ বা প্রাচীর বেষ্টিত জানালাশূন্য গৃহ।

উল্টাডাঙ্গা- উল্টে + ডিঙ্গি। উল্টে পড়ে রয়েছে এমন ডিঙি নৌকাযুক্ত।

শিয়ালদহ- শৈবাল থেকে 'সিয়ালা' + দহ = হ্রদ। অর্থাৎ শৈবালযুক্ত মজা হ্রদ। ডঃ সুকুমার সেনের এই নির্ধারণ একেবারে সঠিক। বেলেঘাটা= বালুকাময় ঘাট যেখানে। মনে রাখতে হবে যে ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে এসব অঞ্চলে মজা ভাগীরথীর খাত এবং তারও বহু পূর্বে নিকটবর্তী দক্ষিন অঞ্চলে সমুদ্র-সংগম ছিল।

বেহালা- বে= শূন্য হাল = নৌকার হাল চিহ্নিত ভূভাগ।

বঁড়িশা-মাছ ধরার বঁড়াশি যেখানে তৈরি হ'ত ও পাওয়া যেত এমন বাঁশ ঝোপ-পূর্ণ স্থান। একই সূত্রে 'বরিশাল'= বঁড়িশ-বঁড়শি (প্রাকৃত 'বডিস'), বঁড়শি + আল।

কোন্নগর- কোণ + নগর। অর্থাৎ গঙ্গাতীর থেকে কোণে যে নগর।

রিষড়া- ঋষি + সাঁও ওড়া, অড়া = গৃহ। ঋষির বাড়ী চিহ্নত যে গ্রাম।

মানকুন্ড- 'মান' পদবীধারী কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির খনন + করা কুন্ড যেখানে।

রানাঘাট- রানা (সাঁও)= সিঁড়ির ধাপ। ঐরকম ধাপযুক্ত নদীঘাট যেখানে।

নিমতা, পলতা, আমতা প্রভৃতি। এগুলির 'তা' প্রত্যয় ভাষাতত্ত্বের নিয়মে – বিত্তক = বিত্তযুক্ত এই শব্দ থেকে এসেছে। নিমতা= নিস্ববিত্তক, পলতা = পলবিত্তক অর্থাৎ পলমাত্র বিত্ত আছে এমন, অর্থাৎ প্রায় দরিদ্র। তেমনি 'আমতা' বললে বোঝায় আমের বিত্ত অর্থাৎ সম্পদ্ যুক্ত। 'ফলতা' নামের ব্যুৎপত্তিতে একটু মজা আছে। আসলে নামটা ঐ 'পলতা'ই। আগাগোড়া ওটি বন্দরের মত ছিল ব'লে নোয়াখালি চট্রগ্রাম অঞ্চল থেকে আগত মাঝিরা ওখানে বিশ্রাম নিত। ওদের উচ্চারিত

ভাষায় আমি ‘প’ ফ হয়ে যায়, যেমন পেপার = ফেপার। সুতরাং পলতা = ফলতা ওদের উচ্চারণ থেকেই প্রসার লাভ করেছিল।

বাঙ্‌লা গ্রাম-নাম ও কলিকাতা শব্দের ব্যুৎপত্তি

ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রে লোক-প্রচলিত কোনো শব্দের মূল নির্ণয় করতে গেলে অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে শব্দটির উচ্চারণ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়।পুরানো শব্দগুলি উচ্চারণে এবং কৃচিৎ গঠনভঙ্গিমাতেও নবকলেবর পরিগ্রহ ক'রে এমন রূপ দেখায় যে অভিজ্ঞ ভাষাবিজ্ঞানী ছাড়া কেউ সেগুলির স্বরূপ-পরিচয় চিহ্নিত করতে পারেন না। সাধারণ শব্দের ক্ষেত্র যাই হোক, গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে আরও বহু বিষয়ে সাবধান হতে হয়। কারণ বিশেষ কোনো চিহ্ন, বিশেষ কোনো পরিচিতি ধ'রেই জনমনে গ্রামের নাম গ'ড়ে ওঠে। যেমন, ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় কোনো ইতিবৃত্ত বা ঘটনা, ব্যক্তি বা জাতির বৈশিষ্ট্য, কোনো ঠাকুর-দেবতা পাল-পার্বণ, এমন কি রেভিনিউ বিভাগের খেয়াল-খুশিও গ্রামনামের কারণ হতে পারে। এগুলি বিবেচনা না ক'রে, এমনকি যথাস্থানে একবারও না গিয়ে কেবল ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকটি বাঁধা গৎ সম্ভল ক'রে আর যাই হোক বাঙ্‌লা গ্রাম নামগুলির সূত্র ধরা যায় না। অনর্থক কিছু কল্পনা ক'রে ফেলতে হয়। এবিষয়ে আরও লক্ষণীয় এই যে কোল-মুণ্ডা অর্থাৎ সাঁওতালী-শব্দের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পশ্চিম বাঙলার বহু গ্রাম নামের সূত্রনির্ণয় সঠিক হবে না। ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে এই নাম গুলির বেশ-কিছু সংস্কৃত-মূল থেকে জাত অর্থাৎ তদ্‌ভব, কিছু সাঁওতালী-মূল, কিছু সংস্কৃত-সাঁওতালী মিশ্রণ, কিছু ফারসী বা মিশ্রিত ফারসী। কিন্তু এ ছাড়া অন্য বিভ্রান্তিকর ব্যাপারও রয়েছে। কোনো মৌলিক শব্দের লিখিত রূপে মূল শব্দটার উপর এমন আবরণ, এমনতর রঙ্‌ চড়ে যায় যে তা থেকে আসল শব্দটি আবিষ্কার করা বেশ দুরূহ হয়ে পড়ে। এজন্য মূলের অনুসন্ধানীকে বহুদর্শী হতেই হবে। গ্রামের বর্তমান নাম পূর্বস্থলী, কিন্তু প্রাচীন পুঁথিতে পাই পুরর্বলী, পুরথলী। বেশ বোঝা যায় আগেকার নাম পুরস্থলী। পুরথলী নামটা ভালো শোনায় না বলে সংস্কৃতজ্ঞ লোকেরা পূর্বস্থলী করে নিয়েছেন। অম্বিকা-কালনার অম্বিকা নামটা মাত্র কিছু কাল আগে দেওয়া। প্রাচীন গ্রন্থে এর নাম আম্বয়া। আম্ব শব্দ হল আম্র শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ। পাঠান আমলে ওখানে মুল্লুকপতির অফিস ছিল এবং ওটি আম-বাগানের জন্য দেয় ট্যাক্‌স্‌ আদায়ের কেন্দ্র ছিল। কাল্‌না পার্শ্ববর্তী গ্রাম, নামের উৎপত্তি কালনাম শিবের মন্দির থেকে। তেমনি বাঁকুড়া শব্দটি মূলে অনার্য,

বাঁকুড়া ধর্মঠাকুরেরও নাম, আবার পদবীতেও পাওয়া যায় এর সংস্কৃত-ঘেঁসা ভদ্রোচিত লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছিল বাংলা ঠিক এইভাবে সংস্কৃতের আভিজাত্যের ধারণায় চালিত হয়ে শীলহট্র বা শীলহাট্য শব্দটি, যা থেকে ইংরেজিতে হয়েছে সিলেট, তাকে এককালে করা হয়েছিল শ্রীহট্র, কাঁচড়াপল্লী কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়া শব্দের অর্থ মহুয়ার ফল), পাইকপাড়াকে পক্কপল্লী এইরকম। এরা কলকাতার মিজাপুরকে মৌর্যপুর এবং বালিয়াঘাটাকে বা বেলেঘাটাকে বিল্বঘৃটা কেন করেন নি তা অবশ্য বলতে পারিনা। এই প্রবণতার বশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামের মূল নাম তুলে দিয়ে নোতুন নামের প্রবর্তন করা হচ্ছে। যেমন কবিকঙ্কণ মুকুন্দের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার গ্রাম গুচুড়ে অর্থাৎ গো-চর-ডিহা শুনতে পাই বর্তমানে এর নাম হয়েছে বিষ্ণপুর কি এরকম কিছু। রানাঘাটের আগের গ্রাম পায়রাডাঙ্গা অর্থাৎ পায়রা পদবীযুক্ত লোকদের ডাঙ্গা এখন নাম নিতে চলেছে প্রীতিনগর। কুশডিহা গ্রামের শিক্ষকমশায়েরা গ্রামটিকে কুশদ্বীপ বানিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে পৌরাণিক মহিমার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছেন। পাঠ্যাবস্থায় আমার এক সতীর্থ তাঁর গ্রামের নাম বাইশপাত্তড়ার শুদ্ধিকরণ করে পোস্টকার্ডে দ্বাবিংশতিপত্রিকা লিখে বাড়ীতে চিঠি দিয়েছিল, সে চিঠি পৌঁছায় নি।ইদানীং আবার বাঙ্লা নামের ইংরেজি রূপান্তর থেকেও উচ্চারণ-বিভ্রাটের এবং লেখায় গোলোযোগের সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন, শব্দটা মশানজোড় (স্মশান থেকে মশান) ইং খবরের কাগজ পড়ে ভদ্রলোকদের বলতে শোনা যায় ম্যাস্যানজোর। শব্দটা হ'ল আসনশোল, আসন এক প্রকার গাছ। লেখা হচ্ছে আসানশোল। এইভাবে উচ্চারণ থেকে লিখনেও অর্থাৎ বর্ণপাতেও বিভ্রাট বাধায় কম নয়। শব্দটা হল চোরিনী, উচ্চারণে চুরনী, লেখায় চূর্ণী, অর্থের সৃষ্টি করে চূর্ণ করে যাহা। যেমন শাঁখাচোরিনী হল প্রেতিনীর আখ্যান, মৃত্যুর পরও শাঁখা পরার আগ্রহ থাকে, সুতরাং শাঁখা চুরি করে। শাঁখ চূর্ণ করে এমন অর্থ নয়। উচ্চারণ-বিভ্রাট ও লিখন-বিভ্রাট থেকে বাদ্-ই-শিবপুর অর্থাৎ রাজস্ব গণনা থেকে বাদ দেওয়া হ'ল এমন শিবপুর দাঁড়িয়েছে 'বাজে' বিশেষণে। আসলে ফারসী শব্দ বাদ্ এর দ্ টার উচ্চারণ প্রলম্বিত, সেটা বাঙ্লায় বাদও হতে পারে, বাজও হতে পারে। এই ধরনেরই একটা ব্যাপার প্রাচীন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিতে বিপর্যয় ঘটিয়ে আসছে। শব্দটা হ'ল ঐতরেয় আরণ্যকের "বঙ্গাবগধাচেরপাদাঃ" চের এবং পান্ড্য এ দুটি দক্ষিণাত্যের অনার্য শাখার মানুষ। পান্ড্য শব্দ প্রাকৃত উচ্চারণে হয় পাড়, পুঁথিতে লেখায় পাদ। আর বগধ সব সময়েই বগধ উচ্চারিত ও লিখিত হতে পারে। আদি 'ম' ও 'ব' পরিবর্তনশীল। তা ছাড়া শব্দগুলি সন্ধিভুক্তও হয়েছে। এর ফলে টীকাকার সায়ন যিনি ভাষাবৈজ্ঞানিক একেবারেই ছিলেন না তিনি বাঙ্লা দেশের লোককে সাপ, পাখী রূপে ব্যাখা করেছেন। এর সঙ্গে অত্যায়মায়ুঃ বর্ণনাকেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন উচ্ছন্ন গিয়েছিল বলে। অত্যায় শব্দের ইন্দো-ইয়োপীয় ভাষাবিদেরা অর্থ করেছেন –বাড়-বাড়ন্ত ব'লে। সুতরাং এই দাঁড়ায় যে বঙ্গ, মগধ, চের এবং পান্ড্য এই চার অনার্য শাখার লোক এককালে খুব প্রবল ছিল। সায়নের ব্যাখ্যায় চালিত ও বিমূঢ় হওয়া আজও

ব্যাপারটা গোলমেলে হয়েই রয়েছে।

পশ্চিম বাঙ্‌লার গ্রাম-নামের অনেকগুলিই সাঁওতালী-মূল অথবা সাঁওতালী আর্যের মিশ্রণ। বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে আমাকে নিয়তই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আগেকার খ্যাতনামা অভিধানকারেরা সাঁওতালী শব্দগুলিকে না জেনে সংস্কৃতমূলে চালিত করেছেন দেখি, যেমন 'খাটো' শব্দ 'কষ্ট' থেকে এসেছে। ফারসীর দিকে লক্ষ্য না রেখে 'সঞ্জ' শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন গুঞ্জন বা গঞ্জনা থেকে। এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। গ্রাম-নামের কোষ্ঠী-ঠিকুজি বের করতে গিয়েও তাঁকে অনর্থক সংস্কৃত এমন কি বৈদিক সংস্কৃতের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। সেরকম অনুমান যে অসম্ভব তা তাঁরা বুঝেও বুঝতে চাইচ্ছেন না। আবার এমন ক্ষেত্রও রয়েছে যেখানে সংস্কৃত শব্দ থেকেই সরাসরি বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি দেওয়া যায়, কোথাও কোনো গোলমালের অবকাশ নেই, এমন ক্ষেত্রে অযথা দূরান্বয় করেছেন। এমনই একটি শব্দ হ'ল 'কলিকাতা'। মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এই লিখিত রূপটির ব্যবহার সাধুভাষায় প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। শব্দটির মৌখিক উচ্চারণ হ'ল কলকাতা বা কোলকাতা। কিন্তু ঠিক তাও নয় 'কোল্কেতা'ই এর প্রকৃত চলিত উচ্চারণ, যা বনেদী বাসিন্দা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মুখে শোনা যেত এবং বোধ হয় আজও শোনা যায়। হুতোম প্যাঁচার নকশায় মৌখিক উচ্চারণে 'কলকেতা'।এই উচ্চারণে অবলম্বন করে মধ্যযুগে গেলে দাঁড়ায় 'কইলকেতা'। এইবার লিখিত 'কলি' শব্দ যা বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে। মধ্যযুগের নিয়ম হল শব্দের মধ্যেকার অপিনিহিত অথবা অন্য পরিবর্তন ক্রমে আগত ই বা উ কে লেখার সময় পরবর্ণে যোগ করে দেওয়া। এই হিসাবে উচ্চারণে চাউল লেখা হয়েছে 'চালু' উচ্চারণে আউশ(=আবৃষ) লেখা হয়েছে আশু যার ফলে আশু ধান্য শব্দে শীঘ্র যে ধান জন্মে এমন ভুল অর্থই লোকে জানে। উচ্চারণে খেউড় লেখায় হয়েছে 'খেড়'। উচ্চারণে মইষ (মহিষ)লেখা হয়েছে 'মষি'।এবার কলি বা উচ্চারিত 'কইল' সংস্কৃত কোন শব্দের প্রাকৃত রূপ তা বিবেচনা করতে গেলে 'কপিল' শব্দেই আসতে হয় অনিবার্য ভাবে। অতএব কোলকেতা বা লিখিত কলিকাতা শব্দের প্রাচীন সংস্কৃত রূপ হবে কপিল-ক্ষেত্র। প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এখন ঐ 'ই' এর আভাস যুক্ত উচ্চারণ বজায় আছে। কপিল মুনিকেই বুঝতে হবে যিনি সাংখ্য দর্শন-প্রনেতা।বর্তমানে সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে কপিলমুনির উৎসব হয়। সেই দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগে বঙ্গোপসাগর আরও অনেক কাছে ছিল আর সুন্দরবন ছিল আরও কাছে। বঙ্গোপসাগর ক্রমে দক্ষিণে সরে সরে যাচ্ছে। অতএব কলিকাতা শব্দটি নিঃসন্দেহে তদ্‌ভব, এবং আমাদের গর্ব এই যে সেই ঐতিহ্যপূর্ণ কপিল-ক্ষেত্রেই বা আজব শহর কলকেটাতেই আমরা বসবাসের ও সেই সঙ্গে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সাহিত্যিক হাত-পা ছোড়ার অধিকার পেয়েছি।

বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি

ভাষার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ জনসমাজের ব্যবহারিক বোধের পথ ধরে এগিয়ে যায়, কোনো পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কৃত্রিম নির্মাণ অনুসারে নয়। তবে এমন কোনো লেখক যদি জন্মান, যিনি সহানুভূতিশীল অন্তঃকরণ দিয়ে জনমানসের স্বভাব প্রকাশের মর্ম আয়ত্ত করতে পারেন ও বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক নিয়ে তার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ আরও সুচিহ্নিত করতে পারেন, তাঁকেই সার্থক স্রষ্টা বলা যেতে পারে। নিছক পণ্ডিত যাঁরা তাঁরা কালে কালে অনায়াস-বিকশিত ভাষার বিশ্লেষণ করতে পারেন, ব্যাকরণ নির্মাণ করতে পারেন, এমনকি ব্যাকরণ-শুদ্ধ বিশেষ একটা ভাষারূপও গঠন করে ফেলতে পারেন, কিন্তু ওরকম শুদ্ধও কৃত্রিম নির্মাণের নিরিখে চলমান ভাষা প্রবাহকে বেশীদিন অবরুদ্ধ রাখার শক্তি তাঁদের থাকে না। চলমান ভাষাকে সমুন্নত করার ক্ষমতা থাকে উচুমাপের স্রষ্টাদের যাঁরা পূর্বপ্রচলিত ভাষাভঙ্গির মর্ম অন্তঃকরণে গেঁথে নিয়ে তারই মূলসূত্রে উন্নয়ন সম্ভব করতে পারেন সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে। যেমন করেছিলেন আগেকার দিনের চন্ডীদাসাদি পদাবলীকারেরা, মুকুন্দ কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রমুখ এবং আধুনিকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্র।

আমাদের মাতৃভাষার আদিজননী সংস্কৃত হলেও অনার্য অর্থাৎ বিশেষভাবে কোল-মুণ্ডাদের বাক্‌রীতির প্রভাবে বদলাতে বদলাতে অবশেষে স্বকীয় প্রাণশক্তি অর্জন করে নিয়ে সে ভাষা প্রথম পরিস্ফুটভাবে দেখা দিয়েছে আদি চন্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা কাব্যে। এর আগে থেকেই নোতুন শব্দ, নোতুন ইডিয়ম, নোতুনভাবে ক্রিয়াপদের বিন্যাস, কর্তা-কর্ম-সম্বন্ধ প্রভৃতি কারকের নবরূপায়ণ, জোড়াক্রিয়ার ব্যবহার, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত এবং সর্বোপরি বাক্যের মধ্যে পদও বাক্যাংশের বিশেষ রীতিতে স্থাপনা প্রভৃতিসহ আমাদের ভাষাজননী মূখে মূখেই অনেকটা পৃথক্ মূর্তি অর্জন করেছিলেন এবং প্রতীক্ষা করছিলেন সাহিত্যিকদের লেখনীমুখে আরও সূচারুরূপে বাইরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। চন্ডীদাস কৃত্তিবাসাদি কবিরা তাঁকে সেই সহায়তা দিয়েছিলেন। কবিতাটা ছন্দোবদ্ধ ব্যাপার হোলেও বুঝে নিতে হবে যে অক্ষরমাত্রিক রীতির পয়ার-ত্রিপদী এবং অনার্যরীতির ছড়ার ছন্দ এমনতর নির্মাণ যে তার সঙ্গে মৌখিক গদ্যের একেবারে অহিনকুল

সম্পর্ক থাকে না। পদস্থাপনের ভঙ্গিটাকে সামান্য এদিক ওদিক ক'রে নিলেই তা গদ্যে দাঁড়িয়ে যায়। পদ্যগত ছন্দের বাহনে পাঁচশ' বছর অনায়াসে কেটে যাওয়ার পর আধুনিক সমাজের কঠিন প্রয়োজনে ছন্দোবাহিনীকে ধরতে হোল গদ্যের মুর্তি। পুরানো শিল্প-সজ্জার আড়ালে থাকা এর সরল স্বচ্ছন্দ চলমান মুর্তিরদিকে না তাকিয়েই নয়াগদ্যের কঠিন পথে, পাদচারণা করাতে এগিয়ে এলেন মিশনারিরা পণ্ডিতদের সঙ্গে নিয়ে। এলেন উইলিয়াম কেরি, এলেন মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম, রাজীবলোচন, তারিণীচরণেরা, আর কিছুপরেই আসরে নামলেন রামমোহন ও সংবাদপাত্রিকদের গোষ্ঠী। বিদ্যাসাগর এলেন বেশ কিছু পরে। এমনকি তত্ত্ববোধিনীর'ও প্রকাশের পর।

বিদ্যাসাগর ইচ্ছা করলে সংস্কৃতের ন্যায় বা ব্যাকরণ বা সাহিত্যের উচ্চতম পাণ্ডিত্য অর্জনে আত্মনিযোগ করিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হয়ে থাকার সময় ছাত্ররা সংস্কৃতটা কিভাবে সহজে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে নজর দেন, আর বিদ্যালয়-পরিদর্শক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জেলায় বাঙলা স্কুল স্থাপন করেন ও বালিকাদের শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দেন। সেই সঙ্গে শিক্ষার উপযোগী বাঙলা বই লিখতেই বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অনুবাদের বই 'বেতাল পঁচিশের' পরই দুচার বৎসরের ব্যবধানে লেখা হতে থাকে পাঠ্য ইতিহাসের বই, শিশুশিক্ষা,বোধোদয়, শকুন্তলা, বর্ণ পরিচয় কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস প্রভৃতি। কী সংস্কৃতে কী বাঙলায় বিদ্যাসাগরের ঝোঁক ছিল সরলীকরণের দিকে। বস্তুতঃ জ্ঞানবুদ্ধি উন্মেষের শুরু থেকেই তিনি সংস্কৃতিমান ও ত্যাগী মহৎ ইংরেজ ও মিশনারিদের কর্ম প্রয়াসে অন্তরে অন্তরে উদ্‌বৃদ্ধ হতে থাকেন, সতীদাহ নিবারণের ঘটনায় প্রবল উৎসাহ অনুভব করেন ও নারীমুক্তিমূলক সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে থাকেন। পরবর্তী যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশংসায় আমরা যতই পঞ্চমুখ হই না কেন, প্রগতিপন্থী আধুনিক নৃজাতিরূপে আমাদের সংগঠনে ইংরেজদের অবদানের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আমাদের দিতেই হবে। ইংরেজ-সংস্পর্শে আসা বিদ্রোহী বিদ্যাসাগরের স্থায়ী কীর্তির দুটো দিক-শিক্ষার সংস্কার ও বিস্তার আর নারীমুক্তি-এরই মর্মে বিদ্যাসাগরের পুস্তক-প্রণয়ন ও সামাজিক আন্দোলন আবর্তিত হয়েছে। অথচ এই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে গ্রামীণ মানুষ ছিলেন, তাই গ্রামে প্রচলিত মূল মাতৃভাষার স্বরূপ আর নিরক্ষর সরল মানুষগুলির উদার মনুষ্যত্বের প্রভাবও তাঁর জীবনে সক্রিয় ছিল।

বিদ্যাসাগর-গঠিত বাঙলার বাক্যনির্মাণ বিষয়েও তাঁর মানসিক গ্রামীনতা ও সহজ সরলতার বিষয় চিন্তনীয়। তখনকার গ্রামগুলি যাত্রা, পাঁচালি কীর্তন গীতে সারা বছরই মুখর থাকত। এ আমাদেরই বাল্যকালে দেখেছি। তার একশ' দু'শ বছর আগে তা যে আরও ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ অনুমান দুই সুলভ। আমাদের শিশু-কিশোরদের মাতৃভাষা শিক্ষা মধ্যযুগে এমনকি উনিশ শতকেও ঐ পরিবেশ থেকেই মোটামুটি হয়ে যেত। মধ্যযুগের পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে লেখা ও

সুরসহযোগে গাওয়া হলেও কীর্তন পাঁচালিগুলির বাক্যার্থ গদ্যের মূর্তি ধ'রেই যে জনচিত্তে প্রবেশ করত ও স্থান পেত এটা সহজ সত্য। গায়েনেরাও যে মুখে গদ্য ব্যবহার ক'রে তাঁদের বক্তব্যের সূত্র ধরিয়ে দিতেন তারও প্রমাণ ছিল, এমনকি তা আমরাও পেয়েছি। তা ছাড়া এও দেখা যায় যে পয়ার-ত্রিপদী বাগ্‌ভঙ্গিমা গদ্যের রীতি বেশী দূরবর্তী ছিল না। ক্রিয়াপদ এবং অন্য দুটো একটা শব্দকে এদিক ওদিক করে নিলেই সরল কবিতা রচনাগুলি গদ্যের আকার সহজেই পেয়ে যেত। " শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা। বিজনে করেন বাস রচি পর্নশালা"। অথবা-"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী। ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।অথবা কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে আসিয়া পশিল মোর কানে" এমনতর নির্মাণকে গদ্য ব'লেও গ্রহণ করতে বাধা নেই। আর যাঁরা রামায়ণ, মুকুন্দের বা ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তেন বা শুনতেন, এমন কি চৈত্ন্য-চরিতামৃতের মতো দার্শনিক গ্রন্থ আয়ত্ত করার প্রয়াস নিতেন তাঁদের গদ্যবোধের কোনো অসুবিধা কোথাও ঘটত এমন মনে করা যায় না। সুতরাং বলা যায়, মধ্যযুগে বা উনিশ শতকের প্রথমের দিকে জনসাধারণের সামনে লিখিত গদ্য না থাকলেও আন্তরিক বোধে গদ্যরূপের কোনো অভাব ছিল না। মানুষে মানুষে কথাবার্তাটা তো আর পদ্য নির্বাহ হোত না। অবশ্য সেটা থাকত সরল বাক্য নির্ভর, বাক্যাংশ যোগে দুরান্বয়ের ব্যাপার যথাসম্ভব পরিহার করে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে প্রত্যক্ষভাবে লেখায় গদ্য নির্মাণের প্রবর্তনা যখন এল তখন গদ্যের মহা মহা পণ্ডিতেরা প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর দিকে না তাকিয়ে, সেগুলির মর্মার্থ কান পেতে না শুনেই কোমর বেঁধে গদ্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে গেলে একটা আদর্শ তো সামনে রাখতেই হয়, যার সূত্র ধ'রে নয়া গঠনটা দাঁড় করানো যেতে পারে। এর সমাধানে গদ্যরথীরা কেউ সামনে রেখেছিল সংস্কৃতকে, কেউ বা ইংরেজিকে। বাঙলায় বাক্য-গঠনের দিক থেকে যে দুটোই কম-বেশী বিজাতীয়। মোটামুটি সংস্কৃতকে আদর্শ ধ'রে, বাক্যাংশগুলিকে সমাসবদ্ধ ক'রে তারই আশ্রয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এবং কিছুটা তাঁরই অনুসরণে উইলিয়াম কেরি। কিছু পরেই নির্মাতাদের দলে যোগ দিলেন রামমোহন ইংরেজি গদ্য অনুসরণ ক'রে, বাক্যাংশগুলিকে নানাভাবে মূল বাক্যের অন্তর্ভূত করার ইংরেজি কৌশল নিয়ে। বলা বাহুল্য, এদেঁর নির্মাণের উৎসাহে যে রীতির গদ্য সৃষ্ট হ'ল তা বাঙলার স্বকীয় বাগ্‌ভঙিমার দিকে গেল না, সাধারণের কাছে জটিল ও দুর্বোধ্য থেকে গেল। এই অবস্থা থেকেই 'ভাষা' বাঙলাকে মুক্তি দিলেন বিদ্যাসাগর, অবশ্য এঁদের বেশ কয়েক বৎসর পরে। তাঁর প্রথম ও গতানুগতিক অনুবাদের বই বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃতের সমাসভারাক্রান্ত শব্দ গ্রন্থন থেকে মুক্ত নয়, কিন্তু শীঘ্রই তিনি নোতুন পথ ধরলেন 'শকুন্তলা'র অনুবাদে, যা ঠিক অনুবাদ নয়, একজন কাহিনী কুশল সাহিত্যিকের নবনির্মাণ। বিগত পাঁচশ বছর ধ'রে কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে বাঙলা গদ্যের যে প্রাণসত্তা স্পন্দিত হয়ে আসছিল তা এতদিনে তিনি ধ'রে ফেললেন। ছোট ছোট বাক্যাংশকে

বিরাম-চিহ্নিত ক'রে খুব সহজভাবে এবং পারস্পর্যের সঙ্গে মেলালেন মূল বাক্যের মধ্যে।

মধ্যযুগের বাঙলা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাতে যে, যাহা, যত, যদ্যপি, যাহাতে প্রভৃতি যোগে জটিল বাক্য নির্মাণের প্রয়োজন থাকলেও হেতুবাচক শব্দ ও অসমাপিকার সাহায্যে বাক্যাংশের পর বাক্যাংশ যোগ করে বাক্য দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য করার অভ্যাস লেখককুলের ছিল না। গদ্য নির্মাণে কর্মবাচক, ক্রিয়া বিশেষণাত্মক, সম্প্রসারক বা অন্যবিধ বাক্যাংশের প্রয়োজন দেখিয়ে রামমোহন স্পষ্টভাবে বললেন- 'এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না"। ফলে বাক্যগুলোকে –ইতে –ইলে অসমাপিকা ও সংযোজক বিয়োজক অধ্যায়ের সাহায্যে একাধিক বাক্যাংশ- যুক্ত করে দীর্ঘ ও জটিল ক'রে তিনি নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন, এমন কি পদ-সন্নিবেশের প্রচলিত রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটাতে লাগলেন। রাম মোহন বিরচিত একটা ছোট দৃষ্টান্তও দেখা যেতে পারে- "বেদান্ত শাস্ত্রের 'ভাষা'য় বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না হইয়া (?) কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যুনতা করিতে পারেন"। আর যাই হোক, এ বাক্য বাঙলা বাক্য হয় নি। সে সময়কার সমাচার-দর্পন, সংবাদ-কৌমুদী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলি প্রচারের স্বার্থে গদ্যকে খানিকটা সাবলীল করার চেষ্টা করেও আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ হতে পারে নি, যেমন-

এক্ষণে ইংলণ্ডীয় কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য হওয়াতে
দিকে দিকে লোকেরদের জ্ঞান ও অর্থ সভ্যতার
বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক সাধারণ লোকেরদিগকে
বিদ্যাদানার্থ নানাস্থানে পাঠশালা হইয়াছে ও
হইতেছে"।

অন্যপক্ষে মৃত্যুঞ্জয় নির্মিত গদ্য বহুক্ষেত্রেই সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে দাঁড়িয়ে, যেমন-

"আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহ্ংকার কুজ্ঞানেতে
কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ"।

বলতে গেলে বাঙলা গদ্যের নির্মাণে ইংরেজির দাস ও সংস্কৃতের দাস এই দু' শ্রেণীর কেউই আগেকার বেশ কয়েক শতাব্দী ধ'রে প্রচলিত বাঙলার দিকে তাকান নি এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করতে চেষ্টা করেন নি। দেখা যায়, দর্শনের মত যুক্তিতর্কের বিষয় নিয়ে লেখা চৈতন্য-চরিতামৃতে বিষয়গত দুরূহতা থাকলেও অন্বয়ের দুরূহতা নেই। ছন্দের প্রয়োজনে লাইনে লাইনে ছেদ ও মিল রাখার জন্য বাক্যগুলিকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে এমন তত্ত্ব মেনে নিয়েও বলা যায় যে সহজবোধ্য ও গতিশীল বাঙলা বাক্যের স্বরূপ অনুধাবন ক'রে তার স্বচ্ছন্দচারণ যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন, যেমন-

সেই ত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি

জগতের উপাদান প্রবীন প্রকৃতি।।
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা।।
কৃষ্ণশক্তো প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্তো লৌহ যৈছে কর এ জারণ।।

এরকম ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদগুলো দুএকটা শব্দ, এমন কি বাক্যও আগে পিছে সাজিয়ে নিলেন পদ্য গদ্যরূপ পেয়ে যায়। অর্থাৎ গদ্য নির্মাতাদের প্রয়োজন ছিল নোতুন কিছু সংগ্রহ করা নয়, পুরানোকেই গুছিয়ে নবরূপ দেওয়া। নিচে দেওয়া দুটি বাক্যে যদি অদ্যপি ও অসমাপিকা সহ একত্র বদ্ধ ঘটিল বাক্যগুলিও বোধের দিক থেকে কোথাও বাধা সৃষ্টি করছেনা-

'যদ্যপি আপণে প্রভু হয়েন বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান।।
হেন বাক্য হইল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে।।

ইতে এবং ইলে যুক্ত অসমাপিকাগুলো বাঙলায় তাদের ক্রিয়ারূপ বর্জন করে প্রায়ই বিশেষণ-বোধক বা ক্রিয়া বিশেষণ বোধক বাক্য-বাক্যাংশ বোঝানোর সহায়ক হয়েছে, এগুলি বাক্যাংশের সংক্ষেপেরও সহায়ক হয়েছে। ইতে প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকাগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগেও দাঁড়িয়ে গেছে-

সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হৈল সোনা দেখিতে দেখিতে।।

ইলে প্রত্যয়ও কেবল অসমাপিকা বোঝানো থেকে সরে গিয়ে বাঙলা ভিন্ন অর্থ দ্যোতনা করেছে। নব উদ্যমে অধ্যবসায়ী গদ্য নির্মাতারা এসব দিকে বিশেষ তাকান নি বলেই মনে হয়। বিপরীতে মেঘনাবধের ভাষা দেখুন, বাক্যে ইংরেজি অনুসরণের ফলে তা দূরান্বয়-কিষ্ট হয়ে পাঠকদের বোধে বাধারই সৃষ্টি করেছে, যেমন "সম্মুখ সময়ে পড়ি" ইত্যাদি। সংস্কৃত ও অপরিচিত শব্দের ব্যবহারের জন্য নয়, ইংরেজির অনুকরণের ফলেই তা তখনকার পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। এরকম ক্ষেত্রে গ্রামে প্রচলিত সহজ সরল বাক্যরীতির পক্ষপাতী বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' রচনার পর থেকে জনচিত্তে সহজেই স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। অসমাপিকার সাহায্যে ও পদবিন্যাসে বক্তব্যের পারস্পর্য রক্ষা করতেই একাধিক বাক্যাংশ সমন্বিত হয়েও তাঁর বাক্যগুলি সহজ বোধ্য হয়ে দাঁড়াল। যেমন শকুন্তলা, কাহিনীর প্রারম্ভ-

"একদিন মৃগের অনুসন্ধানে বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে
করিতে এক হরিণ শিশুকে লক্ষ্য করিয়া রাজা
করিতে এক হরিণ শিশুকে লক্ষ্য করিয়া রাজা

শরাসনে শরসন্ধান করিলেন"।

এটি আসমাপিকা যোগে নির্মিত বাক্যাংশ-সমন্বিত সরল বাক্য বর্ণনা গ্রথিত হয়েছে পারস্পর্যক্রমে। অন্য আর একটি অংশে কর্মবাচক যৌগিক বাক্য মূল বক্তব্যের বোধে কোনো আড়ষ্টতাই সৃষ্টি করেনি, প্রত্যাশিত বক্তব্য জানিয়ে পাঠকরা শ্রোতার তৃপ্তিই এনে দিয়েছে, যেমন-

"শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ, আপনার অপরাধ
নাই, জাহারা ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয় তাহাদের
ঐরূপই স্বভাব হইয়া থাকে"।

অন্য আর একটি বর্ণনাত্মক অংশ লক্ষ্য করলেও সরলতা সহজবোধ্য তার দিকে বিদ্যাসাগরের আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যাবে-

"অল্পবয়সে বিদ্যানুশীলন বিষয়ে বার্কেলের সবিশেষ
অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, তদীয় পিতা তাঁহাকে
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন"।

এখানে বাক্যশেষের মূখ্য বক্তব্য অংশের কারণ-বাচক সরল পরিপূরক হিসাবে 'হওয়াতে, অসমাপিকার যোগে যে খণ্ডবাক্যটি প্রারম্ভে বসানো হয়েছে তা ইংরেজির অনুসরণে গ্রথিত হলেও বক্তব্যের পারস্পর্য রক্ষা করায় বোধের পক্ষে দুঃসহ হয়নি। কাহিনীও সাহিত্যের বিষয় ছাড়া চিন্তামূলক বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ঝোঁক যে বাঙলা ভাষার সুচির-প্রবাহিত প্রাণবন্তর দিকেই ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। একেবারে গোড়ার দিকে লেখা "বাঙ্গালার ইতিহাস" ইংরেজির অনুসরণে, কিন্তু পদও বাক্যবিন্যাসে মাতৃভাষায় শাসনই লক্ষনীয় হয়েছে-

"তিনি (অর্থাৎ মীরকাসিম) সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ইংরাজদিগকে ও নিজের সৈন্য ও কর্মচারীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক প্রথমতঃ তাহার হিসাব প্রস্তুত করিলেন ও তৎপরে সেই সকল পরিশোধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন এবং মীরজাফরের শিথিল শাসনকালে রাজপুরুষেরা সুযোগ পাইয়া যত টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে সেইসকল টাকা আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন"।

সংক্ষিপ্ত দু'টি বাক্যাংশ সহ যৌগিক বাক্য। কর্তা ও সমাপ্তিবোধক ক্রিয়াপদগুলির সঙ্গে পরপর এমনভাবে পদগুলি অন্বিত হয়েছে যে অর্থবোধের জন্য দ্বিতীয়বার ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন হয় নি। পূর্ব-উদ্‌ধৃত সমাচার দর্পনের ভাষার সঙ্গে এরকম দৃষ্টান্তের বিপরীতমুখে তুলনা করা যায়।

বিদ্যাসাগরের যুক্তি তর্কমূলক লেখা বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব প্রয়োজন বশে স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দে যৎসামান্য পীড়িত হয়েও বাক্যের দিক থেকে দুর্বোধ্য হয় নি। এর কারণ ঐ একই, বাক্যনির্মাণ বিদ্যাসাগরের খাঁটি বাঙলা রীতির দিকে অজ্ঞাত সংস্কার, যার জন্য রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয় –তর্কপঞ্চাননাদির মত বিদ্যাসাগরকে 'নির্মাতা' আখ্যা দেওয়া যায় না। বাঙালীর পক্ষে যা অনায়াস

সেই পথেই আদ্যন্ত চলে গেছেন তিনি। পদবিন্যাস সহ বাক্যের স্থাপনা, পারস্পর্য ক্রমে ও থেমে থেমে খণ্ডবাক্যের যোজনা তাঁর গদ্যকে অনায়াস সুতরাং সাদরে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। এরই ভিত্তিতে বঙ্কিম সোজা পায়ে সাহাসিক হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন 'দুগেশনন্দিনীতে'। দেখতে হবে, বেশী দুএকটা সংস্কৃত শব্দবা অন্য যে-কোনো ভাষার শব্দের যোগ থাকলেই মূল ভাষাটা বৈদেশিক হয়ে পড়েনা। এখনকার বাঙলায় শতকরা তিরিশ-চল্লিশটার মতো সংস্কৃত শব্দ এবং যথেষ্ট ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেও ভাষাটা বাঙলাই থাকছে, কারণ, এর ক্রিয়া-কর্ম নিমিত্ত-সম্বন্ধ প্রভৃতির সংগঠন ও বাক্যের নিজস্ব চাল। "বিরসিঙা'র (বীরসিংহ গ্রামের নাম, সাঁওতালী শব্দ, অর্থ- অরণ্যের সূর্য) সিঙবোঙা' সেই প্রভাতের আলোকই আমাদের দেখিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের গোড়ায় মিশনারিদের প্রচার-প্রয়োজন, ফোট উইলিয়ামে পঠন-পাঠন এবং সংবাদপত্র প্রকাশনার তাগিদে ছাপার অক্ষরে যে গদ্যের সৃষ্টি হয় তার ভালোমন্দ দুটো দিকই আছে। ভালো এই দিক থেকে মানুষ গদ্যের মূর্তি প্রকাশ্যে দেখতে পেলে, আর মন্দ এই যে, সে গদ্য আর যাই হোক, ঠিক বাঙলা হোল না। আঠারো শতাব্দীর গদ্যের কিছু নমুনা সহজিয়াদের পুঁথিতে ও বৈষয়িক চিঠিপত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা হয় ফারসী প্রভাবিত আড়ষ্ট, নয় অশিক্ষিত ব্যক্তিদের লেখা।পনেরো-ষোলো শতকে, বিশেষত শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলেছিল তাতে তর্ক বিতর্ক সহ মৌখিক ভাষণ বেশ কিছুটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এ সহজেই ভাবা যায়, আর প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়ের কাছাকাছি নমুনা রক্ষিত আছে সে গদ্যের পদাভাষ্যে। চৈ-ভগবত ও চৈ-চরিতামৃতের তর্ক-বিতর্কমূলক আখ্যানগুলির পরিবেশন পরীক্ষা করে দেখলেই তখনকার গদ্যরীতি ধরা পড়বে। উনিশী পণ্ডিত রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় অথবা রামমোহন কেউই সেদিকে গেলেন না। কেবল সাহিত্যসৃষ্টি যাঁদের লক্ষ্য ছিল, তাঁরাও প্রচলিত ছড়াও রূপকথার আধাপদ্য থেকে প্রেরণা নিতে পারলেন না। যার ফলে ছাপা অক্ষরের বাঙলা গদ্য প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছিয়েই রইল। বিদ্যাসাগরকে বাঙলা গদ্যের মৌল স্রষ্টা বলা যাবে না, কারণ সে সৃষ্টিকার্য তো পাঁচশ' বছর ধরে চলেই আসছিল, কিন্তু বিরসিঙার 'ষিঙঠাকুর' যে তাঁর নবীন আলোকে সে পথটা আমাদের চিনিয়ে দিয়েছিলেন তা নিঃসংশয়ে স্বীকার করতেই হবে। এই আলোকেই বঙ্কিমের সঞ্চরণ ও ভাষার শক্তিবর্ধন, এই আলোকেই রবীন্দ্রের পদক্ষেপ।

বাঙ্লা ছন্দ, সুনীতিকুমার ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর ODBL গ্রন্থে বাঙ্লা ভাষার উপর শ্বাসাঘাত ধর্মের কার্যকারিতার বিবরণ দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে বাঙ্লা ছন্দের প্রসঙ্গে এসেছেন।কারণ, ছন্দ ভাষার প্রাণধর্মের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সেই সেই ভাষার ছন্দের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়ে পড়ে।আমাদের ভাষায় সেই প্রকৃতির অনুসন্ধানে সুনীতিকুমার দেখেছেন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে পূর্ব-মাগধী শাখা এবং বিশেষভাবে বাঙ্লা, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণে শ্বাসাঘাত (Stress, ঝোঁক, বল) নীতি আশ্রয় করেছে। বাঙ্লা ভাষার আদিযুগের পর থেকে উচ্চারণে এই ঝোঁকের প্রবণতা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাঙ্লার আংশিক সাদৃশ্যও লক্ষণীয় হয়েছে। পার্থক্য এই যে, বাঙ্লায় ঝোঁক নিয়মিতভাবে শব্দের প্রথম অক্ষরে (অক্ষর= syllable), ইংরেজিতে তা নয়, তা ছাড়া ঝোঁকের প্রকৃতিতেও কিছু পার্থক্য ধরা যেতে পারে। আচার্য পুনশ্চ দেখেছেন, বাঙ্লা বাক্যের উচ্চারণরীতি হল কয়েকটি শব্দের মিলিত এক একটি গুচ্ছ যা নিয়ে বিরামযুক্ত উচ্চারণের একটি প্রবাহ। স্বাভাবিক এই বিরামকে যতি(pause, breath-pause) বলা যায়। এক,দুই, তিন, এমনকি চারটি শব্দের এক একটি গুচ্ছের পর ঐ বিরাম আসে। সেক্ষেত্রে মূল ঝোঁক পড়ে শব্দগুচ্ছের প্রথম শব্দটির প্রথমে। গুচ্ছমধ্যবর্তী অন্যান্য শব্দের আদ্যক্ষরে ঝোঁক থাকলেও তা তেমন প্রবল হয় না। তা ছাড়া এও বলা যায় যে গদ্য-উচ্চারণে বা সাধারণের কথাবার্তায় ঐ বিরাম প্রায়শ অর্থানুসারে, স্বল্প-অর্থসমাপ্তির (Sense-pause) সঙ্গে মিলিয়েই ফেলা হয়। এই যতি, যা গদ্যের উচ্চারণকে অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে, তা কিন্তু পদ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুরধর্মের (Rhythm) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রয়োজনে অর্থধর্মকে উল্লঙ্ঘন করতে কবিতার যতির বিন্দুমাত্র দ্বিধা ঘটে না। পরবর্তিকালে সুনিতিকুমার যখন ব্যাকরণ রচনা করেন তখনও তিনি গদ্য ও পদ্যের Sense-pause কে ছেদ এবং breath-pause কে যতিরূপে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সুনীতিকুমারের এই ভাষা-পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবাশ্রিত (descriptive)। তাঁর পূর্বে পশ্চিমা পণ্ডিতদের বাঙ্লা ভাষা আলোচনায় এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় ঘটেনি, মতদ্বৈধ

ছিল, এদেশীয় বৈয়াকরণ ও ছান্দসিকদের আলোচনায় স্ববিরোধ ছিল যথেষ্ট, তবে ঐসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসা ও পরস্পরবিরোধ তাঁকে সুসমঞ্জস একটি ধারনায় উপনীত হতে প্রেরণা দিয়েছিল নিশ্চয়ই। ODBL যখন লেখেন তখনকার তরুণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা থেকে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন ব'লে উল্লেখ করেছেন এবং অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি আখ্যা এবং কিছু উদাহরণও তাঁর গ্রন্থ থেকে সমাহরণ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল পরে যখন ব্যাকরণ লেখেন তখন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্‌লা ছন্দের বৈজ্ঞানিক মুলসূত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে আচার্য নিজকৃত ব্যাখ্যানের প্রতিরূপ অনুভব ক'রে তাঁর দেওয়া নামকরণ তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, শ্বাসাঘাত-প্রধান বিকল্পে তাঁর ব্যাকরণ-পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন এবং আরও লক্ষণীয় এই যে, তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান (অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের চতুর্মাত্রিক পর্বগণনা থেকে তিনি বিরত হন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র তখন ঐ দুই বিষয়ে চতুর্মাত্রিক যতি ও পর্বের পক্ষপাতী ছিলেন। অমূল্যধনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সুরধর্মগত নামকরণ গ্রহণ ক'রে, ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে পূর্বে তিনি যা আন্দাজ করেছিলেন তারই বিস্তারিত সিদ্ধি অন্যের হাত দিয়ে ফিরে গ্রহণ করলেন, এটি বেশ কৌতুকজনকই বটে। অবশ্য কী ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থে, কী ব্যাকরণে তিনি মৌলনীতি প্রদর্শনেই তাঁর আলোচনা সীমিত রেখেছিলেন, কবিদের তাবৎ রচনায় যেসব বিস্তৃত বৈচিত্র্য এবং আপাত-বিরোধ দেখা যায় তার সামঞ্জস্য নির্ণকল্পে শ্রম নিয়োগ ক'রে ছন্দ বিষয়ে পৃথক্ গ্রন্থ রচনার সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন নি।

বাঙ্‌লা ছন্দের ক্রমবিকাশকে ইতিহাস-অনুগত ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমে বুঝ্‌তে হবে বাঙ্‌লা অন্যান্য আধুনিক ভাষার মতই জীবন্ত সচল অগ্রগামী। এর উচ্চারণরীতি একশ' দুশ' বছর ধ'রে পরিবর্তিত হতে হতেই চলেছে এবং ভবিষ্যতেও কত পরিবর্তন হবে। বাল্যকালে আমার পাঠশালার এক বৃদ্ধ গুরুমশায়কে বলতে শুনতাম-সরিষা, আঁকুশী, আলিপনা, আঙটী, পানিফল, রাজতন্ত্র, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি। আমরা উচ্চারণ করতাম-সরষ্যা, আঁকশি, আঙটি, আলপনা পা'নফল, রাজ্‌তন্ত্র প্রভৃতি। বর্তমান পূর্ববঙ্গ উচ্চারণ আইজ, কাইল, চাইর,কইর্‌যা, আষ্ট,ডাকাইত, প্রভৃতি চারশ' বছর আগে সারা বাঙলারই ছিল। আরও আগে তদ্ভব শব্দের (তৎসম তো বটেই) শেষের অ,ই,উ স্পষ্ট উচ্চারিত হ'ত, যেমন পাত (অ), কাম (অ) আজি, আজু, আঁখি, বহু=(=বধূ), তীন (অ)= তিন্, আমার (অ), কানাইর (অ) প্রভৃতি। মধ্যযুগে ক্রমাগত স্বরমধ্য ব্যঞ্জন লোপ করায় প্রবণতার ফলে যে-সব স্থানে অই, অউ, আই, আউ উচ্চারণ ঘটেছিল, সে সব স্থানে প্রথম-প্রথম উক্ত দুইস্বর উচ্চারণে পৃথক্‌মূল্যের ছিল, পরে সেগুলি দ্বিস্বরে অথাৎ মিলিত একটি দীর্ঘস্বরে রূপান্তরিত হয়। এই সব পরিবর্তিত উচ্চারণ কবিদের ছন্দোরীতিতেও মাত্রামূল্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে ঐসবের অনেক বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু রক্ষশীলতার বশে কিছু থেকেও গেছে আবার। একটি দৃষ্টন্ত দি'। ছন্দোনির্ণয়ে এ দৃষ্টান্তটি গুরুপূর্ণ। আজকের

মৌখিক ভাষায় আমরা বলি- মেঘ্ জল্ চোখ্ দেশ্ (বি) ষাদ্ (আ) মার্ (ভার) তের্। নিজেকে পরীক্ষা করুন, দেখবেন ঐ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (Syllable) গুলি উচ্চারণে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের সমমূল্যই পাচ্ছে উচ্চারণকালের দিক থেকে। অর্থাৎ 'আ' বলতে যে পরিমাণ সময়, কাশ্ বলতেও সেই পরিমাণ সময়, আকাশ, দু'মাত্রায় দুটি অক্ষর। মধ্যযুগে ঠিক তা ছিল না। ঐগুলির স্বরান্ত উচ্চারণ লোপ পাওয়ার পর পূর্বেকার দু'অক্ষরের দু'মাত্রা মূল্য টান দিয়ে পূরণ করা হতে লাগ্ল, অন্ততঃ ছন্দের ক্ষেত্রে। দু'অক্ষর এক হয়ে পড়্ল কিন্তু টান দিয়ে মাত্রামূল্য দুই-ই রেখে দেওয়া হ'ল। উচ্চারণে যে ক্ষতি হ'ল টান দিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করলাম। আজও তাই চলছে। অন্ততঃ অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে। আর শ্বসিত রীতির ছন্দের প্রায়শই ওগুলির মাত্রা এক, ক্বচিৎ দুই হতেও পারে। আসলে মৌখিক ভাষা গতিশীল হয়েছে, ছন্দোবোধ থেকেছে রক্ষণশীল। একটু ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে বলা যায়, আজ থেকে একশ' দেড়শ' বছর পরে ঐটুকু রক্ষশীলতার বালাইও ঘুচে যাবে। বাঙ্লার স্বাভাবিক উচ্চারণের সঙ্গে যে ছন্দের বেশী মিল, সেই ছড়ার ছন্দ বা শ্বসিত ছন্দই থাকবে, মাত্রাবৃত্ত রীতিটাই অতিকৃত্রিম ও প্রত্ন হয়ে পড়বে, আর পয়ারজাতীয়ের স্থান নেবে গদ্যচ্ছন্দ, এখনই যার অধিকারের প্রবল প্রতাপ দেখা যাচ্ছে।

ছন্দের পর্বগত (পর্ব=Bar, দুই যতির মধ্যবর্তী অক্ষর সমষ্টি) অক্ষরগুলির মাত্রামূল্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তনের এই সব রীতি বুঝতে হবে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের মূলপাঠ নির্ণয় করার সময় আমরা দেখেছি, হইল (হৈল), লইয়া (লৈয়া, লয়্যা), কৈল এবং করিল-প্রভৃতি শব্দকে তিনি ছন্দের প্রয়োজনে কখনও দু'মাত্রার কখনও তিনমাত্রার মূল্যে স্থান দিয়েছেন। পরে দু'মাত্রার বেলায় কৈল, বৈল, কিন্তু তিনমাত্রা পূরণের প্রয়োজনে করিল, বলিল। তা ছাড়া অক্ষরমাত্রিক (তানপ্রধান) রীতিতেই মূলতঃ ছন্দ নির্মাণ করে গেলেও তিনি যৌগিক অক্ষরকে (অন্ পুন্ সন্ বক্ চক্ প্রভৃতি) ছন্দের প্রয়োজনে কখনও একমাত্রার মূল্য দিয়েছেন, কখনও দু'মাত্রার। এর দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে ব্যাপারটিকে ব্যাতিক্রম বলা যায় না। হয়ত মুখের কথাতেও তখন ঐ দুমাত্রা রীতি সমর্থনের অন্ততঃ একটা আভাস বিদ্যমান ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ঠিক তাই। এমন কি যৌগিকের যে দ্বিমাত্রিকতা মাত্রাবৃত্তরীতির আজ অবশ্যকরণীয় নিয়ম, ব্রজবুলি পদাবলীতে তাও অমান্য করা হয়েছে, অবশ্য খুব বেশী ক্ষেত্রে নয়। রবীন্দ্রনাথ দিক্প্রান্ত দিক্সীমা, ঐ (ওই) প্রভৃতি শব্দের গ্রন্থনে অক্ষরমাত্রিকের যৌগিক অক্ষরগুলিকে কদাচিৎ এক, কদাচিৎ দুই মাত্রা ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং আরও নানান্ আপাত-ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, কিন্তু ছন্দের সুরধর্মে ঠিক চলে গেছে, শ্রুতিকটু হয়নি। দিক্ শব্দ সমাসবদ্ধ হলেও তার স্বাধীনসত্তাও পাঠককে শ্রোতাকে ভূলতে দেয় না। বৈজ্ঞানিক বোধের অভাবে ঐরকম দুর্বিপাক আধুনিক কবিতায় ছন্দ-চর্চায় ঘটেছে। 'অনেকদিন খিদিপুর ডকের অঞ্চলে' এই পঙ্ক্তির নেক্ ও দির্ এ দুই সিলেব্ল্কে আধুনিক কবি একমাত্রা ধ'রে পয়ার (১৪ মাত্রার) মেলাতে চেয়েছেন, অথচ সে চেষ্টা দুরূহই

হয়েছে, কারণ লেখায় দৃশ্যত অনেক ও দিন, খিদির ও পুর একীকৃত হলেও উচ্চারণস্মৃতিতে অনেক ও খিদির স্বাধীন শব্দ। সুতরাং 'নেক' ও 'দির' শব্দান্তও যৌগিক হিসাবে দু'মাত্রার মূল্য পাবে। "অনেক দিন খিদির পুর ডকের অঞ্চলে। কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরুখোঁজা করে"।। এ দুই চরণের প্রথমটি পরিস্ফুট ধ্বনিমাত্রিকতার, দ্বিতীয়টি অক্ষরমাত্রিকতার। ছন্দোময় বাক্ কিছু কৃত্রিম অথচ মনোহর। তবে এতে স্বাভাবিক উচ্চারণের অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম ঘটানো যেতে পারে, এবং তা সুন্দরও লাগে, কিন্তু পরিচিত ও অভ্যস্ত কথনের রীতিকে কখনো একেবারে উল্টে পাল্টে দেওয়া যায় না,

সুনিতিকুমারের প্রাথমিক আলোচনার পূর্বেই বাঙ্লায় তিন রীতির ছন্দ লক্ষ্যগোচর হয়েছিল এবং তিনি প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা ও নামকরণের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ছন্দের আলোচনায় সুনীতিকুমার দেখেছিলেন যে বাঙ্লায় এবং সেই সঙ্গে অসমীয়া ওড়িয়ায় শ্বসিত উচ্চারণরীতি প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রামূলক রীতি থেকে সমমাত্রিক (যতিসহ গোটা সুরধর্ম ধ'রে ১৬) অক্ষর মূলক রীতির নব্যপদ্ধতির জন্ম দিয়েছে। নব্যরীতির এই ছন্দের মূল ব্যাপারটি তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ধরিয়ে দিলেন। এই রীতির উচ্চারণ কেবল যে শব্দের তথা শব্দগুচ্ছের আদিতে ঝোঁকের সৃষ্টি করেছে তা-ই নয়। যতির বিরামকে আরও দীর্ঘ ও স্পষ্ট করেছে এবং শ্বাসাঘাত ও যতির মাঝখানে শব্দগুচ্ছের এক একটি পর্বের সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশেরও যতির স্থান ছিল, কিন্তু তার মূল্য ছিল নগণ্য। যতি প্রায় না দিয়েও মাত্র স্বল্প টান রেখে একটি সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ চরণ উচ্চারণ করা চল্ত। কিন্তু বাঙ্লায় তা সম্ভব নয়। প্রথমের দিকে, যখন শব্দের শেষের স্বর বিলুপ্ত হয়নি তখনই পয়ারে প্রথম-আট এবং পরের ছয়ের শেষে পূর্ণযতি সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুনীতিকুমারের উপলব্ধিতে অপভ্রংশ পাদাকুলকের ষোলমাত্রা চাল পয়ারেও একহিসেবে ছিল ও আছে, যতির দু'টি বিরামের মধ্যে ঐ দুটি মাত্রা-সময় সুপ্তভাবে থাকে, সুরসহ (Rhythmic quality) যাঁরা পয়ার আবৃত্তি করেন তাঁদের কণ্ঠ মনোযোগ সহকারে শুনলেই তা ধরা পড়বে। মাত্রা-নিয়ন্ত্রিত পাদাকুলক ছন্দোবন্ধ থেকে ঝোঁক-প্রযুক্ত পয়ারের পর্ব যখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্টিত হচ্ছে এমন সময় পূর্ব চলিত পূর্ণ ধ্বনিমাত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির একটা বিমিশ্রণ ঘটেছিল। পরে ধীরে ধীরে অক্ষর মাত্রিকতার পূর্ণ প্রতিষ্টা ঘটেছে কবিকঙ্কণ রায়গুণাকরে এসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খুলে দেখুন-

নীল জলদসম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।।
সীসত শোভয়ে তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সময়ে যেহ্ন উয়ি গেলা সূর।। ইত্যাদি।

এর প্রথম দুই ছত্র লক্ষ্য করুন। প্রথম ছত্রের 'নী' এই মৌলিক অক্ষর এবং কুন্ এই যৌগিক

অক্ষর এবং দ্বিতীয় ছত্রের চম্ অক্ষরকে দু'মাত্রা করে ধরলে তবেই ৮ + ৬ (অথবা ৮ + ৮) এর চাল সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ঐ দুই ছত্রে ধ্বনিমাত্রিকের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। কবিতাটির পরের ছত্রগুলিতে অবশ্য ঐরকম ব্যতিক্রম আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্যত্র বহু পদে ১২/১৩ অক্ষরের (Syllable) চরণ দেখা যায়, সেগুলিতেও কোথাও কোথাও প্রাচীন দীর্ঘমাত্রকতার আশ্রয় নিলে তবেই ৮ + ৬ এর সমাধান ঘটে। যেমন,-এহা দেখি রসত মন কর দূরে, গা(ই)ল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ, আতিবড় দুষ্ট হৃদয় বনমালী। ত্রিপদীর (অর্থাৎ ত্রিপর্বিক ৮+৮+৮+২) ক্ষেত্রে যেমন –সর্বাঙ্গ সুন্দরী তোএ দেব মুরারী মোএঁ, হংস রএ সরোবরে শুআহো পাঞ্জরে কুয়িলী সে নন্দন বনে। অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ প্রভৃতির এবং ব্যঞ্জনান্ত যৌগিকের দু'মাত্রার সংস্কার তখনও কবির ও শ্রোতার মন থেকে মূছে যায় নি। কবিকঙ্কণের সময়েও যায় নি, তার প্রমাণ, তিনি অক্ষরমাত্রিক রীতিতে কাব্য লিখলেও যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে প্রয়োজনে দু'মাত্রার মূল্যও দিয়েছেন। যেমন, শূন্যে করিয়া স্থিতি চিন্তিলান মহামতি; নিরুপম প্রকাশ মন্দ মধুর হাস; মধুর সংগীত কবিকঙ্কণে ভণে ইত্যাদি। সুনীতিকুমার দেখেছিলেন যে কৃষ্ণকীর্তনের পয়ারে আই আউ প্রভৃতি যেখানে আছে সেখানে গণনায় চরণ ১৪র বেশী অক্ষরের পাওয়া গেলেও বস্তুত উচ্চারণে ও শ্রবণে তা ১৪ই হবে, কারণ, পাশাপাশি অবস্থিত 'আই আউ' স্বরগুলির প্রতি দ্বিতীয়টি তখনই উচ্চারণে ক্ষীণ হয়ে দ্বিস্বরতার প্রায় সৃষ্টি করেছে, ফলে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৪ অক্ষরই। লক্ষণীয় হ'ল সেই সর্বগ্রাসী সুরধর্ম,যার প্রভাবে অল্পস্বল্প এদিক ওদিক সমান হয়ে যাচ্ছে, কুঁদের মুখে বাঁক থাকছে না।

তাঁর অধ্যয়নে আরও একটি ব্যাপার ধরা পড়েছে। এটি কৃষ্ণকীর্তন পরবর্তী মধ্যযুগের। ঐ সময় উচ্চারণে শ্বাসাঘাত-বিস্তারের বশে মধ্য ও অন্ত্যস্বরের বিলোপ জন্য এক অভিনব পরিস্থিতির অভ্যুদয় হয়েছিল। লিখনে চোদ্দ অক্ষরের বেশী, ১৭-১৮ পর্যন্ত, অথচ উচ্চারিত মাত্রা ১৪ই, কারণ স্বরলোপজন্য হস্ ব্যঞ্জনগুলির কোনো মূল্যই তখন দেওয়া হচ্ছিল না। যেমন, রাবণ্ রাজার্ সানা টোপর্ বাণের্ তেজে কাটে (দৃশ্যত ১৮), কৃষ্ণের্ নন্দন্ বীর্ রুষিল যেহেন প্রচণ্ড (দৃশ্যত ১৭)-প্রভৃতি তখনকার অজস্র দৃষ্টান্ত। সুনীতিকুমারের এই অধ্যয়ন যথাযথ, তবে, একটা কথা বলার আছে। আমরা সবক্ষেত্রে পালা গায়ক ও পুঁথি লেখকদের রচনাই পেয়ে থাকি। কবিরা ঠিক কী করেছিলেন তা অন্তত কিছু পরিমাণে আমাদের অজ্ঞাতেই থেকে গেছে। তথাপি পালা গায়েনরা যেহেতু বাঙ্লা ভাষা ভাষীই, তাঁদের আবৃত্তি থেকেও পরিস্থিতির হদীস নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যায়। আর এক কথা। শেষ স্বরলোপের ফলে ক্ষয়পূরণ না হয়ে অর্থাৎ দীর্ঘ না হয়ে হ্রস্ব যে হচ্ছে তার কারণ নিশ্চয়ই ষোড়শ শতাব্দী থেকে ছড়ার ছন্দের বিস্তার। পয়ারের উচ্চারণের সঙ্গে ছড়ার ছন্দের উচ্চারণ মিশ্রিত হয়ে কিছুকাল বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। একমাত্র শ্বসিত উচ্চারণেই আশ্রিত স্বরবর্ণের বিলোপে হলন্ত যৌগিক অক্ষরের এক মাত্রার উচ্চারণের দিকে প্রবণতা সৃষ্টি। এই রীতিতে অক্ষরের সংকোচন-প্রসারণ রূপ স্থিতিস্থাপকতা গুণের প্রসারও লক্ষণীয় ব্যাপার।

দরকার হ'লে চলিত ভাষার ছন্দে এই যে প্রসারণ (নাই নাই না-ই) এর প্রকৃতি অবশ্য মাত্রাবৃত্ত ঢঙ্ থেকে স্বতন্ত্র। যাই হোক, কৃত্তিবাসের অনুরূপ বহু ছত্রের দু'টি দেখা যাক-

অন্য কথা কিতে রাজার মুখে বাইরায় রাম।
নয়ন মুদিলে দেখে দুর্বাদলশ্যাম।।

এর প্রথমটিতে ছড়ার ছন্দের আভাস এবং দ্বিতীয়টিতে পয়ারের ১৪র বাঁধন স্পষ্ট। অবশ্য দ্বিতীয়টিও যে ছড়ার ছন্দে না পড়া যায় এমন নয়। ছড়ার রীতির সঙ্গে পয়ার রীতির মিশ্রণের বিষয়টি ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রও লক্ষ্য করেছেন দেখছি। আচার্য তাঁর OBDLএ অক্ষরমাত্রিক ছন্দে তৃতীয় পরিবর্তন স্তরের উল্লেখ করেছেন। এটি স্পতদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর। পয়ারকে অতিরিক্ত হস্‌যুক্ত ও স্বরময় কথ্যভাষার ভঙ্গি থেকে মুক্ত করে যুক্তাক্ষরযুক্ত, স্বরান্ত সাধুভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়াস চলেছিল এ সময়। হরফ্ গুণে পয়ারকে সাধুভাষার ছন্দ হিসেবে দেখা ও প্রচলিত করার দিকে কবিদের ঝোঁক দেখা যায়। এইভাবে পয়ার-জাতীয় ছন্দ অনেকটা সাধুভাষার ছন্দ হিসেবে স্থান লাভ করেছে। আর এই সাধুরীতি বেশ কিছুকাল ছড়ার প্রসার রোধ করেছিল এমনও অনুভব করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী।

সুনীতিকুমার বাঙ্‌লায় ছন্দোনির্মিতির নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে বিশেষ সুরধর্ম (Rhythmic quality) লক্ষ্য করেছেন। OBDL এ তিনি লিখেছেন- 'The tune made an adjustment of irregularities in the shape of absence of or excess over the requisite number of syllables.' অথবা 'rhythmic adjustment of the line' অথবা 'The rhythm requires the lengthening of দে-শ and বিষা-দ to make up for the loss of final (অ)which counted as a syllable.'বাঙ্‌লায় Syllable এর অতিনির্দিষ্ট মাত্রা নেই, তা সুরপ্রবাহের বশগামী, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যৌগিক স্বরান্ত হলন্ত এবং কি কদাচিং মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরও কখন হ্রস্ব উচ্চারিত হবে কখন দীর্ঘ, তা নির্ভর করবে এবং পর্ববিশ্যাসও নিয়ন্ত্রিত হবে বিশেষ বিশেষ সুরধর্মের দ্বারা, তবে ঐ সুরধর্ম কথনরীতিকে উৎকটভাবে লঙ্ঘন ক'রে অস্বাভাবিকতার সৃষ্ট করবে না, এই যা। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, হৃৎপদ্ম, মৃতপাত্র, দিক্‌প্রান্ত এই ধরণের শব্দে হৃৎ, মৃৎ, দিক্ কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘ হবে, কিন্তু দীর্ঘ করা হলে পরবর্তী যৌগিক পদ্ পাত্ প্রান্ আর দীর্ঘ হবে না, কারণ পরপর দু'টি দীর্ঘ আমাদের উচ্চারণে ও কানে স্বাভাবিক নয়। অবশ্য শ্বসিত ঢঙের ছন্দে এও যে একেবারে অচল এমনও নয়। এইদিক্ থেকে বলা যায়, আধুনিক বাঙ্‌লা যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরগুলির স্থিতিস্থাপকতা গুণ রয়েছে। কেন রয়েছে, কেন কথ্য থেকে ছন্দের উচ্চারণে হৃৎ, মৃৎ, দিক্ এবং ঐরকম অন্, সন্, রক্, ঐ, খৈ, দৈ, নাই প্রভৃতি অক্ষর কোথাও দীর্ঘ হবে, তার মূল নিহিত রয়েছে ঐ সুরধর্মের মধ্যে। এই বিষয় লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথও পুনঃ পুনঃ এই ধরণের মন্তব্য করেছেনঃ

"ছন্দের কোনো অক্যট্য নিয়ম সেই (অক্ষরের মাত্রা গণনা বিষয়ে-লেখক)
এ কথাটা মনে রাখা দরকার .....কিঙ্কিণীতে ঘুণ্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায়
সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা"
"ইংরেজির ছন্দে এ্যাক্সেন্ট এর প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘস্বরের সুনির্দিষ্ট
ভাগ। বাঙ্লায় তা নেই, এইজন্য লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাঙ্লা ছন্দে মাত্রা
বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই" ইত্যাদি।

একদা বিশেষ বিশেষ সুরধর্ম ধরেই ছান্দাসিক অমূল্যধন মুখ্যোপাধ্যায় বাঙ্লা ছন্দের তিনটি পৃথক্ উচ্চারণ পদ্ধতি বা ঢঙ্ নির্ণয় করেছিলেন এবং তদনুজায়ী পর্বের প্রকৃতি এবং পর্বানুগত আক্ষরিক ধ্বনিও মূল্যায়ন করেছিলেন। সুষম পর্বের অর্থাৎ যতি বিভক্ত অংশের ভাগে ভাগে উচ্চারণ এটি ত্রিবিধ বাঙ্লা ছন্দের সামান্য প্রকৃতি। এরই মধ্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্তে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য ও অক্ষরসমুহের পৃথক্ পৃথক্ স্পষ্ট ধ্বনিমূল্য আত্মসমর্পন করেছে তানময় সুরধর্মের কাছে। মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন পর্বমধ্য কথাগুলির বিচিত্র অক্ষরবিন্যাস কতকটা পূর্বেকার প্রাকৃত-অপভ্রংশ ধ্বনিমাত্রামূলক পদ্ধতির অধীন, তা অক্ষরস্থ ধ্বনিগুলির বিশেষ মূল্য দিয়ে মন্থরগতিতে চলতে চায়। আর চটুল নৃত্যের ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে চায় এমন ছড়ার ছন্দের সুরধর্মের সঙ্গে প্রবলভাবে শ্বসিত উচ্চারণের সামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। পরবর্তী কালে ব্যাকরণ রচনার সময় সুনীতিকুমার ছান্দসিক অমূল্যধনের বিবরণযুক্ত ত্রিবিধ নামকরণকে ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে যৌক্তিক ব'লে গ্রহণ করেছেন দেখতে পাই। অবশ্য ঐ নামকরণের সঙ্গে পুরাতন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত নামও বিকল্পে রেখে দিয়েছেন যাতে শিক্ষার্থিদের পক্ষে বোঝার বিভ্রাট না হয়। এর পর নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে নোতুনতর কোনো ধারণার পক্ষপাতী তিনি হতে পারেন নি। কেবল মনে পড়ে, আমাকে তিনি একসময় প্রশ্ন করেছিলেন-"পয়ারের Chanting এ মুসলিম কোনো কোনো গায়ক চার মাত্রার পর যতিবিন্যাস ক'রে এক একটা চরণকে চার ভাগে ভাগ ক'রে পড়েন শুনেছি। পারলে একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবেন তো।" আমার যতদূর জানা ছিল তাতে এরকম দেখা যেত না, এবং আবাল্য রামায়ণ, মনসার ভাসান এবং পটুয়াদের সুরে আবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েও কি-হিন্দু কি-মুসলমান কোনো গায়ককেই পয়ার-আবৃত্তিতে চারের পর পূর্ণ যতি দিতে শুনিনি। কারণ, তা দিলে শ্বসিত ছড়ার ভঙ্গিমা এসে যায়। সেই কথা বললাম এবং ভালো ক'রে লক্ষ্য করব এও জানালাম। আসল কথা বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র কি পয়ারজাতীয় কি আট-এর মাত্রাবৃত্তে চারমাত্রায় যতি-নির্দেশের পক্ষপাতী ছিলেন (পরে প্রবোধচন্দ্র অবশ্য ঐ স্থানে লঘুযতি ধরেছেন) আর সেই অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানীর মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে আরও পরে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র যখন Syllabic, Moric এবং Accented ছন্দঃ পদ্ধতিত্রয়ের নোতুন নামকরণ করলেন

(মিশ্রকলামাত্রিক, কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক) তখন সুনীতিকুমার তা গ্রহণ করেন নি, অন্ততঃ উদাসীন রইলেন। তাঁর OBDL এর যে পরিশিষ্ট তিনি পরে যোজনা করেছিলেন তাতে কেবল বলেছেন যে বাঙ্‌লা ছন্দের মৌলিক ব্যাপারগুলি এখন পরিষ্কার ভাবেই বোঝা গেছে, শুধু নামকরণ ও খুচরো কয়েকটি বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ রয়েছে। তাঁর অভিপ্রায়ের অনুসরণে বলা যায়, তানময় সুরধর্ম ও তদনুযায়ী পর্ব; প্রায়-প্রাচীনরীতির অক্ষর-ধ্বনি মাত্রা; শ্বাসাঘাত-মিশ্রিত সুরধর্ম ও তদনুযায়ী মাত্রা-শৈথিল্য-এই তিনটিই হ'ল মৌল ব্যাপার। তা ছাড়া Rhythmic Quality র দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত থাকে বলেই মৌলিক যৌগিক সব অক্ষরই বাঙ্‌লায় কৃত্রিমতা-মনোহর সুরধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চারণের স্বাভাবিক মূল্য উল্লঙ্ঘন ক'রে দীর্ঘায়িত হতে পারে, কোথাও কম, কোথাও একটু বেশী। বর্তমানে আমরা তাঁর দ্বারা স্পষ্টভাবে কথিত না হলেও, তার অভিপ্রায় অনুসারে অন্য দু'একটি বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

খাঁটি পয়ারের চাল আটে-ছয়ে (অথবা আটে –আটে, যতি দু'টি সহ)। এর মধ্যে অর্ধযতি বা লঘুযতি পাঠের স্বাভাবিকতাবশে কোথায় পড়বে? অমূল্যধন বলছেন শব্দভিত্তিক হবে। প্রবোধচন্দ্র বলছেন লঘুযতি চারে চারেই পড়বে, কিন্তু যেখানে ঐ চার শব্দের মাঝখানে শেষ হচ্ছে সে সব ক্ষেত্রে যতিবিলোপ হবে। যেমন-/'কাননে কু/সুম কলি' অথবা 'পড়েছে তো/মার পরে প্রদীপ্ত বা/সনা/অর্ধেক মা/নবী তুমি অর্ধেক ক/ল্পনা' প্রভৃতি ক্ষেত্র শব্দ মধ্য যতির লোপ। কিন্তু তাহলে আর ছন্দের ছন্দত্ব থাকে কোথায়, তার প্রয়োজনই বা কী? শব্দার্থ একপথে চলে, ছন্দ, সুর, তাল চলে অন্যপথে, নিজের পথে। ছন্দের তাল অর্থের বেতালকে মানতে যাবে কীজন্য? যেখানে ছন্দের যতির সঙ্গে শব্দার্থের মিল ঘটছে সেখানে সোনায় সোহাগা। কিন্তু যেখানে তা হচ্ছে না সেখানে ছন্দের প্রাগ্‌-অধিকার না মানলেই নয়। আমাদের গুরুমশায় তো পড়তেন –পার কর বলিয়া ডা/কিলা পাটনীরে। অথবা, 'কিবা শোভা নদীতে ফু/টিল কোকনদ। কই, অর্থবিভ্রাট হচ্ছে না ব'লে আমরা তো খেদোক্তি করিনি। রামায়ণাদির আবৃত্তিতেও তো এই রীতিই দেখি। কবির চিত্তে যে ভাব ও কলপনার লীলা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে এমন ভাষা মানুষের আজও গড়ে উঠেছে কি? কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ বা সুরধর্মকেই প্রধান ব'লে মান্য করতে হবে, স্পষ্টর্থবহতাকে নয়। অতএব যতিলোপ নয়, শব্দভিত্তিক পর্বাঙ্গও নয়, যতি ও অর্ধযতি নিজ খুশীতেই পড়ছে, পড়বে। বলা বাহুল্য মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে পড়তে হবে-'সপ্তা হপরে।। সাতশ ত প্রাণ' অথবা, 'বনচুড়া রঞ্জিল।। স্বর্ণরে খায়। পূর্বদি গন্তের।। প্রান্তরে খায়।'এর অন্যথা সমীচীন হবে না। কবিরা ইচ্ছে ক'রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য এরকম করেন, মাঝে মাঝে তালের খণ্ডন ঘটলে একঘেয়েমি কেটে যাবে, প্রবোধচন্দ্রের এধরণের মন্তব্যও শ্রোতব্য ব'লে বিবেচনা করা যায় না। অবশ্য যে-ক্ষেত্রে ছন্দের উপর শব্দার্থ আধিপত্য বিস্তার করুক এমনতর মনোভাব নিয়েই লেখা হচ্ছে, যেমন অমিত্রাক্ষর অথবা গদ্যচ্ছন্দে, সেখানে যতি বা অর্ধযতি শব্দানুসারেই বিহিত

করতে হবে। সুনীতিকুমার অর্থনিরপেক্ষভাবেই তিন রীতির ছন্দে (অমিত্রক্ষর বাদ দিয়ে) অর্ধযতি বিন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন, যদিচ ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ তা দেখান নি, মতভেদের ব্যাপার রয়েছে ব'লে।

তিনরীতির সুরধর্ম-মিশ্র ছন্দের নামকরণ বিষয়ে সুনীতিকুমার অমূল্যধনের অভিমতই মেনে নিয়েছেন, দলমাত্রিক কলামাত্রিক প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রেও অবহিত হন নি, নিলে নবযোজিত পরিশিষ্টে অথবা ব্যাকরণে তার উল্লেখ করতেন। বস্তুতঃ একটি ঢঙের নাম Syllable (দল) এর উল্লেখ ক'রে, একটির নাম হবে Mora (কলা)র উল্লেখ ক'রে, অন্যটির নাম অনর্থবহ 'মিশ্রকলা' দিয়ে-এ খুবই অসামঞ্জস্যের ব্যাপার দাঁড়ায়। যদি Syllable বোঝাতে 'দল' শব্দই বাঞ্ছনীয় হয়, তাহ'লে ঐ শব্দেই কিছু যোগ-বিয়োগ ক'রে অন্যগুলির বোঝাতে হয়, নতুবা 'কলামাত্রিক' তো ধ্বনি মাত্রিকেই গিয়ে দাঁড়ায়, আর 'মিশ্র' বলতে ঐ দল-কলারই মিশ্রণ বোঝায়। তাছাড়া 'দলমাত্রিক' শব্দ বরং পয়ার ঢঙের পক্ষেই অধিকতর প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। কারণ, অক্ষরবৃত্তেই তো একদল = একমাত্রা (শব্দশেষের নিয়মিত যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত দল ছাড়া) সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় । আরও দেখি, দল-মাত্রাই কি শ্বসিত ছন্দের প্রধান লক্ষণ? প্রধান লক্ষণ তো ঐ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা 'প্রস্বর' যার বলে মাত্রামূল্য অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে 'মিশ্রকলা' নাম। মনে হচ্ছে এ ছন্দ অর্ধেক মাত্রাবৃত্তের ধর্ম রক্ষা করে, অর্ধেক অক্ষরবৃত্তর, তাই 'মিশ্র'। কথা হ'ল এই যে উক্ত পয়ার ঢঙের ছন্দে মাঝের সিলেব্‌ল্ এর দীর্ঘতা অতিকচিত,এক সিলেব্‌ল্=একমাত্রা এর হেরফের হয় না বলেই চলে (হলে বলব, এটি ভুল হ'ল) অথবা শব্দশেষে ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক থাকলে সেখানে দু'মাত্রা। এটি যে নিয়মিত ভাবে কেন হয় তার বৈজ্ঞানিক কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই যে অতিনিশ্চিত সুনিয়মিত একটি ব্যাপার এরই জন্যে ব্যাপক 'মিশ্র' বিশেষণ লাগাতে হবে? আর পুরাতন-স্মৃতির মাত্রাবৃত্ত ঢঙ্ বা সুরধর্মের বিশেষত্ব ধ'রে সুবর্ণিত ধ্বনি-প্রধান যদি অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি-দোষহীন আখ্যা না হয়, তাহলে এর যে আধুনিক স্থির-লক্ষণ (মধ্যযুগে যে ব্যতিক্রমই থাক্ না কেন), যৌগিকের অবশ্য দ্বিমাত্রিকতা সেই লক্ষণ ধ'রেই তো ত্রুটিহীন নামকরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ 'যৌগিক-দ্বিমাত্রিক' বললেই তো সঠিক হয়।

এইবার আলোচনার শেষের দিকে আসছি। ছন্দের প্রকৃতি-বিশেষে পর্ব (Bar) কত কত মাত্রার হবে? পর্বে পর্বে যতিই বা কতক্ষণ থাক্‌বে? ছান্দসিকেরা এর যে জবাব দিচ্ছেন তাতেও দেখা যায় ঐ অন্তর্লীন বিশেষ বিশেষ সুরধর্মই মাত্রাসমঞ্জস পর্ববিভাগের নিয়ন্তা। এবিষয়ে তাঁরা একমত যে শ্বসিত বা ছড়া জাতীয় ছন্দের পর্ব সর্বত্র চারমাত্রা ওজনের। প্রয়োজনমত বাড়িয়ে-ক্মিয়ে চারমাত্রার মাপ ঠিক রাখতে হবে। মাত্রাবৃত্ত বা যৌগিক-দ্বিমাত্রিকে সুনীতিকুমার ও অমূল্যধনের মতে ৫,৬,৭,৮, আর রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের মতে ঐ সঙ্গে চারও। রবীন্দ্রনাথ গানের সুরতালের দিক লক্ষ্য রেখে তিনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মাত্রাবৃত্তের মূলে

তিনের বাঁধন, অন্য দুই রীতির মূলে দুয়ের বাঁধন। মাত্রাবৃত্তের পাঁচ= ৩ +২, ক্বচিৎ ২ + ৩; ছয়ের পর্বের ক্ষেত্রে ৩ + ৩; আটের বেলায় ৩ + ৩ + ২, সাতের বেলায় ৩ + ৩ + ১। এই সব অর্ধযোতি গণনা। রবীন্দ্রনাথের মতে ৯ মাত্রায় পর্ব চলে, অমূল্যধনের মতে চলে না, ৬ + ৩ এ ভেঙে নিতে হয়। বস্তুতই আধুনিকে নয়ের পর্ব অচল, কিন্তু মধ্যযুগে মাত্রাবৃত্তে এমনকি পয়ার-ঢঙেও তা ছিল। কবিকঙ্কণ তাঁর ত্রিপদীবন্ধে ৭ + ৭ + ৯ এর বিষম চালে একচরণ অন্তত ছ'টি ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন ।কবিকঙ্কণের মূল পাঠ আমরা ধ'রে ফেলায় এটিও ধরা পড়েছে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে মাত্রামূলক ৭ + ৭ + ৯ এর ত্রিপদীর পরিচয় রয়েছে। এরই অনুসরণে ব্রজবুলির কবি গোবিন্দদাস বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ৭ + ৯ এর গ্রন্থন করেছেন। ৮ +৮ হিসাবেই ওগুলি আমাদের কানে ভালো শোনায় বটে, কিন্তু যখন দেখা যায় যে ৮ + ৮ করতে গেলে প্রায়শই 'চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝংকরু' এরকম বহু ক্ষেত্রে ভেঙে নিতে হচ্ছে, তখনই সংশয় জাগে এবং ৭ +৯ এর (প্রাঃ পৈঙ্গলের নাগেন্দ্র কি মহেন্দ্র মনে পড়ছে না) মধ্যেই স্থির হতে হয়। যাই হোক, আমাদের পর্ব-ধারণা শক্তি আগের থেকে হ্রাস পেয়েছে একথা মানতেই হবে (কারণটা ঐ 'বল' বা ঝোঁক যা লঘুতর পর্বের দিকে নিয়ে আসে), মাত্রানির্ভর ঢিমে-তেতালা আর ধাতে সইছে না! 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' প্রভৃতি অপভ্রংশের দশমাত্রিক পর্বের ছন্দ, বাঙলায় পাঁচে পাঁচে ভাঙলে তবেই উচ্চারণ সুখাবহ হবে।

পরিশেষে ছন্দের যতির সঙ্গে গানের তালের সম্বন্ধ। সুনীতিকুমার সুরধর্ম বা সাংগীতিকতা লক্ষ্য করেছেন। বিশ্লেষণ ক'রে এ বিষয়টি বোঝান নি। অমূল্যধনের মতে অনেক ক্ষেত্রেই তালের পদক্ষেপের সঙ্গে কবিতায় যতির মিল পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্রের মতে না পাওয়াই স্বাভাবিক কারণ, "বাকবিন্যাস স্বভাবতই নির্ভর করে ভাষাগত ভাবের উপর। সংগীতের পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়। " মনে সন্দেহ হয় যথাযথ কথা শুনছি কিনা, কারণ কথার ভাবের সঙ্গে সুরের সংগতিবিধানই তো রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিল্পের প্রণিধানযোগ্য বিষয়। তা ছাড়া কাব্যাঙ্গ সংগীতেও তাই, কাওয়ালি, একতালা ঝাঁপতাল প্রভৃতি দেখুন, পূর্বেকার গান-কবিতার যতির সঙ্গে মেলে কি না। প্রবোধচন্দ্র উদাহরণ দিয়েছেন- ঐ আসে/ঐ অতি/ভৈরব/হরষে। আমাদের ধারণায় এটি জোর ক'রে ব্যতিক্রম সংঘটন। নৃত্যে প্রয়োগ করার জন্যই ঐধরণের তাল পর্ব গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। নতুবা সাধারণভাবে কবিতাটি-ঐ আসে ঐ/ অতি ভৈরব/ হরষে প্রভৃতি পর্বেও অনায়াসে দাদ্‌রা তালে গীত হওয়ার যোগ্য ছিল। এরকম স্বেচ্ছাকৃত বিভ্রাট তিনি অন্য দুএকটি ক্ষেত্রেও করেছেন। কবিতার উচ্চারণে মাত্রামূল্য গাণিতিক নয়, গানে গাণিতিক, এরকম কথা (প্রবোধচন্দ্র) কোনো পার্থক্যের নির্দেশক নয়, কবিতাতেই বা মাত্রাপাঠ গাণিতিক হবে না কেন? কে ঠিক আবৃত্তি করছে, কে করছে না এ কবিতার সমঝদার বেশ ধ'রে ফেলবেন, ১ মাত্রার জায়গার ১ ১/৪ অথবা দু'মাত্রার জায়গায় ১ ১/২ তাঁর কানে লাগা উচিত। অবশ্য ঐ নিয়ে মারামারি করা হয় না, বা সমঝদার মেলে না, সে ভিন্ন কথা। গান এবং কবিতার তাল ও যতির

মূলে আদিমে একটা মিল ছিলই। কিন্তু সুরে গান আগে, না ছন্দে কবিতা আগে, কে নির্ণয় করবে?

ডঃ দাসের জন্ম বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে, বঙ্গীয় সন ১৩২৩-এর ২৩ আশ্বিন (খ্রীঃ ১৯১৬, ৯ অক্টোবর)। তিনি প্রয়াত হন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ২০০২ সালের ২৮ এপ্রিল। পিতা সতীশচন্দ্র, মাতা কামিনীবালা। গ্রামের মধ্য-ইং বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বাঁকুড়া জিলা স্কুলে চার বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐ সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের আদ্য, ও পুরাণ পরিষদের মধ্য পাস করেন। সেখান থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে বাঁকুড়া মিশনারী কলেজে ইন্টার ও বি এ পড়েন। ১৯৩৭-এ সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হন ও কাব্য-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা পাস করেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্লা প'ড়ে ১৯৩৯ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণপদক সহ পাঁচটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক পান।বাংলা এম এ ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতে কাব্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন পরীক্ষায় পাস। অপরিসীম দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এঁকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়।

এম-এ পাস করার পর বি-টি পাস ক'রে ইনি প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শকের কাজ নিয়ে কাল্না ও খানাকুলে বৎসর খানেক কাটিয়ে এবং ক'লকাতায় দু' একটি স্কুলে শিক্ষকতা ক'রে স্কটিশ চার্চ কলেজে দু' মাস, সিটি কমার্সে চার-পাঁচ মাস এবং উইমেন্স্ কলেজে তিন বৎসর মত অধ্যাপনা করেন। এরপর শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রথম -নমিনেশন পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন ১৯৪৫-এর জুলাইয়ে। প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর সহকারী হয়ে দশ বৎসর কাজ ক'রে (মাঝে দেড় মাস কোচবিহার কলেজ) ১৯৫৫ আগষ্ট মাসে প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কৃষ্ণনগর কলেজে বদ্লি হন ।সেখান থেকে ১৯৫৯-১৯৭৩ পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কলেজে এবং ছ'মাসের জন্য হুগলী কলেজে কাজ করেন।তারপর ১৯৭৩ ১লা সেপ্টেম্বর ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে ।সেই পদে প্রায় সাড়ে সাত বৎসর কাজ করার পর অবসর নেন। অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ তাঁকে তুলনামূলক অভিধান রচনার দায়িত্ব দেয়।কঠিন পরিশ্রম করে ও বয়সের বাধা অতিক্রম করে ১৯৯৬ সালে তিনি সেই অভিধান রচনা সমাপ্ত করেন।কেন সেই অভিধান আজও আলোর মুখ দেখল না সেটাই প্রশ্ন রয়ে গেল। আজ ডঃ দাস নেই। কিন্তু তাঁর অভিধানের কাজ সেই পান্ডুলিপি নিশ্চয়ই সরকারি কোনও স্থানে হেফাজৎ আছে।আমরা আশাবাদী। আগামী দিনে হয়তো কোনও উদার, মহানুভব, চিন্তাশীল, ডঃ দাসের কাজটা যাতে আলোর মুখ দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করতে পারবেন। ইনি

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট সদস্য, বাংলা আকাদেমির কার্যনির্বাহী সদস্য, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ও অনেক কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ।এ'র লেখা গ্রন্থসমূহ হ'ল,যথাক্রমে (১)রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (২)বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (৩)চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী (৪) বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ (৫)সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ (৬) সম্পাদনা- কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (৭)রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার। (৮)বানান বানানোর বন্দরে (৯)১৪০০ সাল ও চলমান রবি (১০)দেশ কাল সাহিত্য (১১)বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য (১২) ব্যাকরণ (তিন খণ্ড) (১৩) সাঁওতালী বাঙলা সম শব্দ অভিধান (১৪)বাছাই প্রবন্ধ এ-ছাড়া রয়েছে নানান্ পত্রিকায় ছড়ানো অগণিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ।'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দাসকে বাঙ্লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রদত্ত ডি-লিট্ উপাধি দ্বারা (১৯৬২) সম্মানিত করেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থটির জন্য 'প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার' (শ্রেষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য ১৯৭৩ সালে),গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার', ১৯৮৭ সালে হওড়া পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত 'সাহিত্য রত্ন' উপাধি, ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক, ১৯৯১ সালে কলকাতা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত 'রবীন্দ্র তত্ত্বচার্য' উপাধি, চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি গ্রন্থটির জন্য তিনি 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান ১৯৯৪ সালে, ১৯৯৫ সালে পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার', ১৯৯৮ সালে পান সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত 'রবিতীর্থংকর' উপাধি।

Initiative By

All the content here is the property of Professor Khudiram Das' Family and hence any use of the contents without the prior permission, shall and will be of legal consequences.

Designed By

azways

http://azways.in/

Email: info@professorkhudiraamdas.com

Call: 9831895614

Web: http://professorkhudiramdas.com/